

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

(শ্রীচৈতন্যের পাঁচশত জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রচিত)

ডঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার

দি বুক ট্রাষ্ট

৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
অলোক মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাষ্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—১৯৮৭

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
কল্যাণী প্রিন্টার্স
১/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতার পাদপদ্মে সমর্পিতপ্রাণা
শ্রীমতী পূর্ণিমা মজুমদার
পূজনীয়াসু।

॥ নিবেদন ॥

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর হৃদয় দেবতা। কবির ভাষায়—
"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

আমার দাদু ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। ছোটবেলায় দাদুর সঙ্গে অনেক মহোৎসব চলতি বাংলায় যাকে বলা হতো 'মচ্ছব', তাতে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শিশু মনে তখন থেকেই একটা প্রশ্ন আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল—মহাপ্রভু কে? এবং কি এমন তাঁর অলৌকিক শক্তি যাতে তাঁর ছবি সামনে রেখে শত শত লোক এমন পাগল হয়ে নেচে-গেয়ে, হেসে-কেঁদে 'হরি-নাম গানের' স্রোতে ভেসে যায়।

কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মহাপ্রভুকে নূতন ভাবে চিনতে পারলুম। এই অলোক-সামান্য পুরুষ যেভাবে পূর্ব-ভারতের তাঁর সমসাময়িক সমস্ত মানুষকেই তাঁর অলৌকিক মহত্ত্বের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন তা সবারই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বাংলার ও উড়িষ্যার সমাজ, সংসার এবং জনজীবনে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাত্মক।

নিয়ম-নিষ্ঠা ও আচার-বিচারের বেড়াজালে আবদ্ধ হিন্দুধর্মের তখন খুবই জীর্ণদশা। হিন্দু সমাজের উঁচু তলার মানুষেরা নীচু তলার মানুষদের জন্য বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এমনভাবে পেতেছিলেন যে এদের হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকাটাই ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে ইসলাম ছিল রাজধর্ম এবং ঐ ধর্মের সার্বজনীনতা সহজেই সমাজের নীচু তলার লোকদের মনকে এই পরিস্থিতিতে আকর্ষণ করছিল।

হিন্দু সমাজের এই যখন অবস্থা তখন মহাপ্রভুর উদয় হয়েছিল প্রভাতের সূর্যালোকের মত। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আসন পাতা

হয়েছিল সমস্ত মানুষের জন্য। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যেই তাঁদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর পাঁচশততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে সবাই যখন তাঁর সম্বন্ধে নূতন করে ভাবছেন, তখন "বুক ট্রাষ্টের" কর্ণধার রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন বললেন, এই উপলক্ষে আমরাও যদি ওঁর স্মৃতি-তর্পণ করতে পারি খুব ভাল হয়।

আপামর জনসাধারণ, যাঁরা শিক্ষার আলোয় আলোকদীপ্ত হননি এখনও তাঁদের কাছে সহজ ভাষায় যদি এই মহাপুরুষের জীবনী পৌঁছে দেওয়া যায়, তবেই মহাপ্রভুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান সার্থক হবে।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই গ্রন্থ রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। কতটা সফল হয়েছি, তার বিচার তাঁরাই করবেন যাঁদের জন্য এই গ্রন্থ লেখা হলো।

পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় মহাপ্রভুকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥"

বিধান-নিবাস
কলি-৫৪
২৩শে মার্চ, ১৯৮৭।

রথীন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ প্রথম পর্ব ॥

আদি-লীলা

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর অন্তরের দেবতা। তিনি আমাদের হৃদয়ের ধন। আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে ১৪০৭ শকের ২২শে ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা। এই দোল পূর্ণিমায় পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্রে তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন।

তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে বসবাস করতেন। তিনি একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী সরল ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাতা শচীদেবী ছিলেন স্নেহ-শীলা ও ভক্তিমতী নারী। ওঁদের সারল্য ও ব্যবহারে সবাই খুশী হতেন। কিন্তু ওঁদের মনে সুখ ছিল না। কারণ শচীদেবীর সন্তান হয়ে হয়েই মারা যেত। এরকম ভাবে আটটি কন্যা সন্তান জন্মানোর পর পরই মারা যায়। তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একেবারে ভেঙ্গে পড়েন।

ওঁরা পুত্র কামনায় ঈশ্বরের আরাধনা শুরু করেন। ওদের দুঃখ ও নিষ্ঠা দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত চিত্ত হয়ে ওদের বর দেন। এর ফলে বলরামের মত সুন্দর ও সবল এক পুত্রের জন্ম হয়। এর নাম রাখা হয় বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এদিকে পুত্র হওয়ায় মিশ্র পরিবারে সবাই আনন্দিত হন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী আরো বেশী করে ভগবানের আরাধনায় ডুবে যান। এর কিছুদিন পরে শচীদেবীর আবার পুত্র হয়। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করার আগেই শচীদেবীর নানা দিব্য দর্শন হতে থাকে। উভয়েই স্বপ্ন দেখেন যে ভগবান নিজেই তাঁদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আনন্দে ও খুশীতে উভয়ের মন ভরে ওঠে। তারপর দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু শচীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। দশমাস দশদিন পার হয়ে যায় সবাই চিন্তিত হন। অবশেষে তের মাসে শচীদেবী পুত্র মুখ দর্শন করেন।

শিশুর চাঁদের মত মুখ দেখে সবাই খুশীতে মেতে ওঠেন। নবদ্বীপের

সমস্ত লোক খবর পেয়ে নানা উপহার নিয়ে মিশ্রদের বাড়ীর উঠোনে এসে জড়ো হন। দেবতারাও নানা ছদ্মবেশে মিশ্র বাড়ীতে এসে দেখা দেন। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। ঘরে ঘরে শুভ মঙ্গলশঙ্খ বেজে ওঠে।

সোনার বরণ এই শিশুর সমস্ত শরীর, হাত-পা, মুখ সবই মনোহর, সুন্দর। মহাপুরুষের সব লক্ষণ এই শিশুর শরীরে আছে। মহাধুমধাম করে ষষ্ঠীপুজো করে শিশুর নাম রাখা হলো নিমাই বা নিমাঞি। শচীদেবীর ছোট ছেলে বলে হয়তো এই নাম রাখা হয়েছিল। অথবা মা নেই বলে মৃত্যুর দেবতা যমের এই শিশুর প্রতি দয়া হবে বলে হয়তো এই নাম রাখা হয়েছিল।

দিন গড়িয়ে যায়, নিমাই আস্তে আস্তে বড় হতে থাকেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই নিমাইকে খুব ভালবাসে। কিন্তু নিমাই বড় দুষ্ট। সে সবসময় নানাভাবে দুষ্টুমি করে সবাইকে বিব্রত করে।

ছেলেবেলায় তার দুষ্টুমির নানা ঘটনা জানা যায়। একবার এক কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ মিশ্র গৃহে অতিথি হন। স্বহস্তে ভাত রেঁধে কৃষ্ণকে নিবেদন করে আহার গ্রহণ করবেন বলে তিনি ধ্যানে বসলেন। কিন্তু সেই ফাঁকে নিমাই একমুঠো ভাত খেয়ে ফেলেন। অতিথি মনে বড় ব্যথা পেলেন। যাই হোক জগন্নাথ পুত্রের হয়ে অতিথির কাছে ক্ষমা চাইলেন। ব্রাহ্মণ আবার ভাত রেঁধে ধ্যানে বসলেন। নিমাই এবারও এক মুঠো ভাত নিয়ে পালালেন। কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ এবার ভাগ্য মানলেন। তিনি ভাবলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন মানুষের খাদ্য জোটে তখন সেদিন হয়তো ঈশ্বরই চান না যে তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। তিনি নিজে আর ভাত রাঁধতে আগ্রহী হলেন না।

শচীদেবী ও জগন্নাথ উভয়েই খুব বিপদে পড়লেন। অতিথি ভগবান। তিনি যদি কিছু গ্রহণ না করেন তবে তাঁরাই বা অন্নগ্রহণ করবেন কি করে। বারবার অতিথিকে অনুরোধ করতে থাকেন তাঁরা। এমন সময়ে নিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপ সেখানে এসে হাজির। হাত-জোড় করে সে অতিথিকে বলল—"প্রভু, আপনি দয়াময়। অন্যের

দুঃখ দেখলে আপনি কষ্ট পান। এখন আপনি যদি কিছু আহার না করেন তবে আমরা সবাই উপোষ করে থাকবো। অতএব আপনি দয়া করে নিজের সেবা গ্রহণ করুন।”

বিশ্বরূপের কথায় কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ আবার রান্না করলেন এবং ধ্যানে বসলেন। এবার ধ্যানে তিনি বালকের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলেন। আনন্দে তাঁর চোখে জল এলো। তিনি বালকের মায়া ডোরে বাঁধা পড়লেন। রয়ে গেলেন নবদ্বীপে।

নিমাই আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলেন। কিন্তু দিন যত যায় নিমাইয়ের দুরন্তপনাও তত বাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সে এখন প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যায়। সেখানে গিয়ে নিমাই নানা দুরন্তপনায় মেতে ওঠে। স্নান করতে করতে কুলকুচি করে কারো গায়ে এঁঠো জল ছিটিয়ে দেয়। কারও কাপড় ধরে টানে। কেউ হয়তো কাপড়-জামা রেখে স্নানে নেমেছে এসে দেখে কাপড়-জামা নেই, কোন ব্রাহ্মণ হয়তো স্নান শেষে চোখবুজে শিবলিঙ্গ পূজো করছেন, চোখ খুলে দেখলেন মূর্তি উধাও হয়েছে। এভাবে নিমাই পূজার ভোগ খেয়ে নিতেন, কেউ হয়তো পাঠের জন্য গীতা এনেছেন, নিমাই সেটা লুকিয়ে রাখতেন। গঙ্গার ঘাটে যাঁরাই আসতেন বালক নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যে তারা সবাই খুবই বিব্রত হতেন।

সবাই এসে জগন্নাথের কাছে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। বালিকারা শচীর কাছে এসে তাদের বিব্রত হওয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। নিমাই মুখে জল নিয়ে কুলকুচি করে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। ব্রতের ফুল ফেলে দেয়, চুলের ভিতর ওকড়ার বীচি (বুনো কাঁটা ফল) গুঁজে দেয়। আরও কত কি নালিশই না করে।

একদিন জগন্নাথ খুবই বিরক্ত হয়ে হাতে একটি ছড়ি নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হলেন। ইচ্ছা, দুরন্ত পুত্রকে কিছুটা শাস্তি দেবেন। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখেন, খবর পেয়ে নিমাই আগেই বাড়ী চলে গেছে। সেদিন কিন্তু অন্যেরা নিমাইয়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কেউ করলো না। বরং মেয়েরা বলল যে, নিমাই যদি দুষ্টুমি করে তবে

তারাই নিমাইকে ধরে নিয়ে যাবে। যেন নিমাইয়ের অপেক্ষায় বসে না থেকে তিনি বাড়ী চলে যান। আসলে নিমাইয়ের দুষ্টুমির মধ্যে একটা স্বর্গীয় মাধুর্যের ছোঁয়া লেগে থাকতো। তাই অসুবিধা হলেও নিমাইয়ের প্রতি কেউ রাগ পুষে রাখতে পারতো না।

কিছুদিন পর নিমাইয়ের হাতেখড়ি দেওয়া হলো। মেধাবী বালক খুব তাড়াতাড়ি পড়াশুনো করতে লাগলেন। মিশ্র পরিবারে সবাই এ সময়ে খুব খুশীতে কাল কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু সুখ বেশীদিন স্থায়ী হলো না। আসলে সংসারে সুখ-দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। তাছাড়া যাঁরা বড় মাপের মানুষ, দুঃখের কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তাঁদের চলতে হয়। নিমাইয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ তখন বেশ বড় হয়েছেন। কিন্তু সংসারে তাঁর মন নেই। প্রায় সবসময়েই বৈষ্ণবদের আখড়ায় তিনি কৃষ্ণনাম করেন। তাঁর মনের এই ভাব দেখে, জগন্নাথ-শচীদেবী ঠিক করলেন যে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিশ্বরূপ তাহলে সংসারী হবেন, ঘরে তাঁর মন বসবে।

বিশ্বরূপ এ কথা শুনতে পেয়ে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। সবাই খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু এই ঘটনায় নিমাইয়ের চরিত্রে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। নিমাইয়ের দুষ্টুমি কমে গেল। তিনি বরং তাঁর দাদার স্থান গ্রহণ করে, এই দুঃখে পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন থেকে তিনি সবসময় বাবা-মায়ের কাছে থাকতেন এবং তাদের নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেন।

"নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরায় সুখে জননী-জনকে ॥"

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ নিমাইয়ের পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও কিছু বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। যাই হোক নিমাই আবার নতুন করে পড়াশুনোয় মন দিল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীতে আবার একটা অঘটন ঘটল। পিতা জগন্নাথের হঠাৎ মৃত্যু হল। শচীদেবী খুব ভেঙ্গে পড়লেন।

নিমাই পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহায্যে পিতার শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কাজ ভাল ভাবেই শেষ করলেন।

মিশ্র পরিবারে চারজনের মধ্যে এখন রইলেন দু'জন। মা শচীদেবী ও পুত্র নিমাই।

নিমাই এর মধ্যেই পড়াশুনোয় যথেষ্ট উন্নতি করেছে। সে এখন টোলের 'সর্দার পড়ুয়া'। অর্থাৎ পণ্ডিতমশাই না থাকলে সেই-ই ছাত্রদের পড়াশুনো দেখে; তাদের শাসন করেন। শচী, নিমাইকে আরো ভাল ভাবে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলেন। তাঁর ইচ্ছা নিমাই যাতে তাড়াতাড়ি পড়াশুনো শিখে নিজেই টোল খুলে বসতে পারে। কারণ টাকা-কড়ি রোজগার না করলে সংসার চলবে কি ভাবে?

পণ্ডিতমশায়রা নিমাইকে ভালবাসেন। সবাই নিমাইয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করেন। এ সময়ে নিমাইয়ের নিজের মধ্যেও কিছুটা অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছিল। নিমাই বা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীকার বৃন্দাবন দাস নিমাইয়ের এই অহংকারকে বলেছেন, বিদ্যা-বিলাস নিমাই সুযোগ পেলেই সকলকে শাস্ত্রচর্চায় যোগ দিতে বলে এবং তর্কে তাঁদের হারিয়ে দেয়। সারা নবদ্বীপেই নিমাই-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। নিমাই তখন থেকে সকলের কাছে নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

নিমাই নিজেই এবার টোল খুলে বসলেন। দেখতে দেখতে নিমাইয়ের টোল ছাত্রে ভর্তি হয়ে গেল। পণ্ডিত হিসাবে নিমাইয়ের তখন খুব খ্যাতি। সুতরাং ছাত্রের অভাব হলো না। শচীদেবী এবার নিমাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী রূপে গুণে একেবারে লক্ষ্মী। বনমালী ঘটক যখন এই সম্বন্ধ নিয়ে এলো তখন গরীবের মেয়ে বলে শচীদেবী কিছু পণ না নিয়েই বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন। নিমাইয়েরও এই বিয়েতে অমত ছিল না। তিনি গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে লক্ষ্মীকে দেখেছিলেন। সুতরাং উভয় পরিবারেই আর্থিক অসুবিধা থাকাতেও বিয়ের কোন অসুবিধা হলো না।

একদিন মিশ্রবাড়ীর দরজায় শুভ শঙ্খ বেজে উঠলো। লক্ষ্মীদেবীই

যেন ঘর আলো করে এলেন। শচীদেবীর হৃদয় আনন্দে ও বাৎসল্যে ভরে উঠলো।

ঘরে সুন্দরী স্ত্রী; কিন্তু নিমাইয়ের মধ্যে পরিবর্তন কোথায়? বিদ্যার অহঙ্কার একটুও কমেনি। যাকে সামনে পান তাকেই তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করেন। হারিয়ে তবে নিরস্ত্র হন। এমনি করেই নিমাইয়ের বিদ্যার অহঙ্কার বেড়ে চলে।

নবদ্বীপ তখন শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র। নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণদের দাপটে সবাই তটস্থ। পাশাপাশি বৈষ্ণবেরা নীরবে নিজ নিজ গৃহে কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ সংকীর্তন করেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের উপহাস করেন। গালাগাল দেন। নিমাই কিন্তু বৈষ্ণবদের এই কৃষ্ণ নাম গান, কৃষ্ণ সংকীর্তনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। তিনিও বৈষ্ণবদের তর্কে আহ্বান করেন। বৈষ্ণবেরা কিন্তু সবিনয়ে তা এড়িয়ে গিয়ে তাঁকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবন্দনার কথা বলেন।

এসময়েই দাক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলেন। তিনি নিজে কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-বন্দনায় তাঁর দিন কাটে। একদিন পথে তাঁর সঙ্গে নিমাইয়ের পরিচয় হল। নিমাই তাঁর কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ-ভক্তি দেখে মোহিত হলেন। দু'জনেই শাস্ত্র-আলোচনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

কিছুদিন নবদ্বীপে কাটিয়ে ঈশ্বরপুরী আবার ভারত-পরিক্রমায় বার হলেন। নিমাইয়ের মনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হলো। বৈষ্ণবদের এই কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-ভক্তি হয়তো তাঁর মনের দরজায় আঘাত করছিল। ফলে তাঁর মনের মধ্যে একটা আলোড়ন চলছিল। মনের এই ভাব দূর করার জন্য তিনি ঠিক করলেন যে তিনি বঙ্গদেশ ভ্রমণে যাবেন।

বঙ্গদেশে নিমাই মনের শান্তি অনেকটা ফিরে পেলেন। তাঁর সুন্দর সুঠাম দেহ, তাঁর-পাণ্ডিত্য সবার মন জয় করে নিল। সব জায়গাতেই তিনি যথেষ্ট সমাদর পেলেন। সবাই তাঁর আচার-আচরণ দেখে শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। যাত্রা পথের সব জায়গাতেই তিনি

বিদ্যাচর্চায় ও শাস্ত্রচর্চায় দিন কাটাতে লাগলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—"শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে।"

এভাবেই দু'মাস কেটে গেল। নিমাই ঠিক করলেন, আর নয়। এবার নবদ্বীপ ফিরতে হবে। এদিকে শচীদেবী পুত্রের খবর না পেয়ে চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। নিমাইয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী স্বামীর খবর না পাওয়াতে ঠিকমত আহার পর্যন্ত করছেন না। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং নিমাই নবদ্বীপে ফিরে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হলো (সর্পাঘাতে মৃত্যু)। শচীদেবী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তবু পুত্রের আশায় প্রাণে বেঁচে রইলেন মাত্র।

তারপর একদিন মায়ের সব দুশ্চিন্তা দূর করে নিমাই ঘরে ফিরলেন। অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। দুঃখের মধ্যেও শচীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে নিমাই সবকিছু শুনলেন। নিজের দুঃখ ভুলে মাকে সান্ত্বনা দিলেন।

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু নিমাইয়ের মনে পরিবর্তন এনে দিল। অন্তরের অস্থিরতা দূর হয়েছে। নিমাই আবার লেখাপড়ায় মেতে উঠলেন। প্রতিদিন শিষ্যদের নিয়ে নিয়মিত টোলে বসেন। বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর এখন আর আকর্ষণ নেই বললেই চলে।

বিদ্যাচর্চা নিয়ে নিমাইয়ের দিন কেটে যায়। কিন্তু শূন্য ঘরে শচীদেবী হাঁফিয়ে ওঠেন। তাঁর আর ঘরে মন বসে না। তিনি তাই মনে মনে ঠিক করলেন, নিমাইকে আবার সংসারী করতে হবে। মেয়ে দেখা শুরু হলো। অনেক দেখেশুনে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শচী পছন্দ করলেন। এক শুভদিনে নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়েতে নিমাইয়ের কতটা ইচ্ছা ছিল জানা যায় না। মনে হয় তিনি মায়ের কথা ভেবেই বিয়েতে অমত করেননি।

নিমাই নূতন করে সংসারধর্মে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন হল না। নিমাই এখনও বিদ্যার গর্বেই মেতে থাকেন। প্রায়ই সামনে যাকে পান, তাকেই তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তারপর কূটতর্কে তাঁকে পরাজিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

বৈষ্ণবদের প্রতি এখন আর তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। বৈষ্ণবেরা অবশ্য সবসময় হরিনাম নিয়ে মেতে থাকেন। অদ্বৈতবাদী গোঁড়া ব্রাহ্মণরা এঁদের নানাভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য যুক্তি আঁটেন। কিন্তু তাঁদের ঘৃণা এবং অত্যাচার যত বাড়ে, বৈষ্ণবেরা ততই আরো বেশী করে নামগানে মেতে ওঠেন।

নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের যখন এই অবস্থা তখন একদিন সেখানে হরিদাস এসে হাজির হলেন। হরিদাস জাতিতে ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তিনি সবসময় কৃষ্ণ-নাম জপ করতেন। কৃষ্ণ-ভাবনায় কাল কাটাতেন। তখনকার মুসলমান মুলুকপতি হরিদাসকে ডেকে পাঠান এবং বিধর্মীর ধর্ম আচরণ করার জন্য হরিদাসকে নানাভাবে শাস্তি দেন। হরিদাস কিন্তু নীরবে সব শাস্তি গ্রহণ করেন। মুলুকপতি এবং কাজি কিছুতেই হরিদাসকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ থেকে বিরত করতে না পারায় তাঁরা হরিদাসকে মুক্তি দিলেন।

হরিদাস ছাড়া পেয়ে প্রথমে শান্তিপুরে এসে আশ্রয় নেন। এখানকার বৈষ্ণবরা তাঁর হরিভক্তি দেখে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়েও কৃষ্ণ-নাম গুণে হরিদাস বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের আপনার জন হিসাবে গণ্য হন।

কিছুকাল শান্তিপুরে কাটিয়ে হরিদাস আসেন নবদ্বীপে। হরিদাসকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা নূতন করে প্রাণ ফিরে পেলেন। অদ্বৈতর গৃহ কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-বন্দনায় আরও মুখর হয়ে উঠলো। বৈষ্ণবেরা সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে কৃষ্ণ-ভজনায় মেতে উঠলেন।

নিমাই-এর সঙ্গে এখন আর বৈষ্ণবদের কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। গৃহে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং টোলে ছাত্র-পড়ুয়া নিমাই এদের নিয়েই দিন কাটান।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু নিমাই ঠিক করলেন পিতার পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় যাবেন। সেকালে গয়া যাওয়া সোজা ছিল না। অনেকে সেকথা বলেও ছিলেন। নিমাই তবু যাওয়াই স্থির করেন।

মনে হয়, নিমাই নিজেও মনে মনে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য সংসার থেকে মুক্তি চাইছি · ।

শুভদিন দেখে নিমাই গয়ার পথে যাত্রা করেন। কোন্ পথে নিমাই গয়া গিয়েছিলেন তার সঠিক বর্ণনা জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ তিনি রাজগীর হয়ে গয়া যান। গয়ায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি পিতৃতর্পণ করে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করেন। এতে তাঁর চিত্তের অস্থিরতা অনেকটা দূর হয় এবং মনের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে।

এখানে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হয়। পুরানো পরিচয়ের যোগসূত্র আবার রচিত হল। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণ-ভজনা, কৃষ্ণ-বন্দনার মধ্যে নিমাই নূতন করে নিজেকে যেন খুঁজে পেলেন। নিজেকে এই নাম-গানের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার তাঁর ইচ্ছা হলো। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্র নিতে চাইলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁকে 'দশাক্ষর' মন্ত্র দিলেন। এই মন্ত্র জপ করতে করতে নিমাইয়ের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তারপর গয়ার মন্দিরে বিষ্ণুর শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করে তাঁর মধ্যে কৃষ্ণকে আপন করে পাওয়ার জন্য আকুতি দেখা দিল। নিমাই নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। সবসময় চোখের জল ফেলেন এবং পাগলের মত আচরণ করেন।

"কৃষ্ণরে বাপ‌রে প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥"

কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা নিমাই কি করবেন, নিজে আর ঠিক করতে পারছেন না। একবার ভাবলেন—আর সংসার নয়, এবার সন্ন্যাস নিয়ে মথুরাতে চলে যাবেন। সেই অনুসারে কিছুদূর গেলেনও। কিন্তু মায়ের নির্দেশ নেওয়া হয়নি সুতরাং শেষপর্যন্ত আবার নবদ্বীপের পথেই যাত্রা করলেন। সম্ভবতঃ মায়ের কথা, বিশেষ করে নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের কথা তাঁর মনে পড়েছিল।

নিমাই নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন। নবদ্বীপের সেরা পণ্ডিত গয়ায় গিয়েছিলেন কিন্তু যিনি ফিরে এলেন তিনি শুধু পণ্ডিত নন, বিষ্ণু-ভক্ত এক ব্রাহ্মণ, যিনি কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা, কৃষ্ণ ভাবনায় সতত বিভোর।

নিমাইকে যত দেখেন, শচীর চোখ ততই জলে ভরে ওঠে। কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে নিমাইয়ের এই পরিবর্তনের খবর বৈষ্ণবদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। শ্রীবাস একদিন শচী গৃহে আসেন সংবাদটির সত্যাসত্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে। শচীদেবীর কাছেই শ্রীবাস নিমাইয়ের পরিবর্তনের বিস্তারিত খবর পেলেন। নিমাইকে দেখে কষ্ট হলেও মনে মনে খুশী হলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, নিমাইকে এবার পুরোপুরি তাঁদের মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে অন্যান্য বৈষ্ণবদের ডেকে নিমাইয়ের এই পরিবর্তনের খবর জানালেন। নিমাইকে শ্রীবাসের গৃহে ডেকে পাঠানো হলো। নিমাই নিজের মুখেই এই পরিবর্তনের কথা সবাইকে জানালেন।

নিমাই এখন থেকে বৈষ্ণবদের মধ্যেই বেশী সময় কাটাতে লাগলেন। শ্রীবাসের গৃহে তাঁর অভিষেক হলো। এরমধ্যে নিত্যানন্দ এসে এই দলে যোগ দিলেন। তিনি নিমাইয়ের মধ্যে ভগবান শ্রীহরির বিভিন্ন রূপ দর্শন করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলেন।

আস্তে আস্তে মহাপ্রভুর আকর্ষণে বৈষ্ণবদের দলে এসে অনেকেই যোগ দিলেন। শুধু শ্রীবাসের গৃহ নয়। এদের হরিনাম সংকীর্তনের ঢেউ নবদ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কালবৈশাখীর ঝড়ের মত, ভাদ্র মাসের বন্যার মত তা নবদ্বীপের সবকিছু ভাসিয়ে দিল। আচারসর্বস্ব হৃদয়হীন ব্রাহ্মণদের ধর্মের ভড়ং এই ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এর মধ্যে নিত্যানন্দ ঠিক করলেন, জগাই মাধাইকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দেবেন। জগাই-মাধাই দুই পাপাচারী ব্রাহ্মণ যুবক। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও এঁরা সবসময় মদ্য পান ও অন্যান্য আরো অনেক খারাপ কাজ করে কাল কাটাতেন। নবদ্বীপের ধর্মভীরু সৎ লোকেরা সবাই তাঁদের এড়িয়ে চলতেন। তবু তাঁদের অত্যাচারের ভয়ে সবাই সবসময় তটস্থ থাকতেন। একদিন বৈষ্ণবদের নিয়ে কীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ তাঁদের বাড়ীতে যেয়ে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে মদ্যপানরত দুই ভাই দৌড়ে এসে এদের গালাগাল দিতে লাগলেন।

কিন্তু নিত্যানন্দ ঠাকুর তাতে ভয় না পেয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—"ভাই একবার কৃষ্ণনাম বল।" 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' সুতরাং জগাই-মাধাই তাতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে কলসীর কানা দিয়ে নিত্যানন্দ ঠাকুরের মাথায় আঘাত করলেন। মাথা ফেটে ঝড় ঝড় করে রক্ত পড়তে লাগলো নিত্যানন্দ ঠাকুরের ; কিন্তু তিনি এতে ভয় পেলেন না, রাগও করলেন না। তিনি বরং সেই অবস্থাতেই জগাই-মাধাইকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গান শুরু করলেন—

"প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই ॥
বলরে হরিবোল ; প্রেমিক হরি প্রেমে দেবে কোল।
তোলরে তোল হরিনামের রোল।
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ,
হেরবি হৃদয় চাঁদ।
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই
ডাকে তাই।"

নিত্যানন্দের কপাল বেয়ে রক্ত পড়তে দেখে জগাইয়ের মনে অনুশোচনা হল। খবর পেয়ে মহাপ্রভু ছুটে এলেন। তাঁর ক্রোধ দেখে নিত্যানন্দ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ওদের হয়ে মহাপ্রভুকে বোঝালেন যে ওরা এখন অনুতপ্ত। মহাপ্রভু যেন ওদের ক্ষমা করেন। নিত্যানন্দের কাতর অনুনয়ে মহাপ্রভুর রাগ দূর হলো। তিনি জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করলেন। জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের দলে মিশে গেলেন। দু'হাত তুলে কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-বন্দনা গাইতে লাগলেন। এ ভাবেই জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার হলো। নবদ্বীপের সর্বত্র তার ফলে বৈষ্ণবদের প্রভাব আরো বেড়ে গেল।

জগাই-মাধাই উদ্ধার হয়েছে। বৈষ্ণবদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। মহাপ্রভু সবাইকে বোঝাতে লাগলেন যে, কলিকালে কৃষ্ণপ্রেম এবং হরিনাম সংকীর্তন সবচেয়ে বড় জিনিস। বৈষ্ণবেরা দলে দলে শ্রীবাসের গৃহে সমবেত হন। সেখানে রাত্রিদিন কৃষ্ণনাম

কীর্তন, কৃষ্ণ-ভজনা। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে যেন উৎসবের সাড়া পড়ে গেল।

বৈষ্ণবদের এই জয়যাত্রায় সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হলেন নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণেরা। কি ভাবে বৈষ্ণবদের জব্দ করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁরা নানা ফন্দি আঁটতে লাগলেন। চাপাল গোপাল নামে একজন লোক শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় একদিন রেখে এল মদ ও নানা অপবিত্র বস্তু। শ্রীবাস দুঃখ বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন। মহাপ্রভু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ-ভাবনায় মেতে থাকার উপদেশ দিলেন। এদিকে এই পাপে চাপাল গোপালের কুষ্ঠ রোগ হলো। অবশ্য মহাপ্রভুর দয়ায় শেষে তার ব্যাধি দূর হলো। সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলো। এতে ব্রাহ্মণরা যথেষ্ট দমে গেলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের মনে নতুন করে উৎসাহের জোয়ার এলো।

অষ্টপ্রহর সবাই নাম গানে মেতে রইলেন। মহাপ্রভুও নানাভাবে লোককে তাঁর অলৌকিক লীলা দেখাতে লাগলেন। কোন দিন তাঁর বলরামের ভাব। কোনদিন নৃসিংহের ভাব। সব লোক প্রেমভক্তি সাগরে ভাসতে লাগলেন আর সারা নবদ্বীপ জুড়ে শুরু হলো দিনরাত নাম-সংকীর্তনের মহোৎসব। কাজীর লোকেরা একদিন রেগে গিয়ে বৈষ্ণবদের মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিলেন এবং সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে সংকীর্তন করলে শাস্তি পেতে হবে।

কাজীর এই নির্দেশ শুনে মহাপ্রভুর খুব রাগ হলো। তিনি ঠিক করলেন যে কাজীর এই নির্দেশ মানবেন না। তিনি তাঁর ভক্তদের তিনটি কীর্তনের দলে ভাগ করে কীর্তন করতে করতে কাজীর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

বৈষ্ণবদের সংখ্যা ও তাদের তেজ দেখে কাজী ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে লুকিয়ে রইলেন পরে মহাপ্রভুর কাছে এসে তিনি গ্রাম-সম্পর্কে তাঁকে ভাগনে বলে সম্বোধন করলেন। প্রভুর সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে তাঁর অনেক আলোচনা হল। শেষে তিনি প্রভুর প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন। কাজী এ কথাও বললেন যে, তাঁর লোকেরা মৃদঙ্গ ভেঙ্গেছে বলে এক বিরাট সিংহ তাঁকে স্বপ্নে শাসিয়ে গেছে যে

তিনি যেন এরকম কাজ আর না করেন। বৈষ্ণবরা এখন থেকে খুশীমত ধর্মাচরণ করতে পারবে, কাজী এ নির্দেশও দিয়ে দিলেন।

জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর কাজীর এই পরিবর্তনও বৈষ্ণবদের মনে নূতন আশার আলো জ্বালিয়ে দিল। তাঁরা মহাপ্রভুকে সামনে রেখে আরো সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত ভাবে ধর্মচর্চায় মন দিলেন।

বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে। নিমাই এবার নিজের দিকে তাকালেন। ভাবলেন, আজ যাঁরা দূরে সরে আছেন, তাঁরা তিনি সংসারের মধ্যে আছেন বলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। তিনি যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন তবে সবাই তাঁর অনুগামী হবে। মহাপ্রভু এইসব কথা ভাবেন। আর মনে মনে প্রস্তুত হন সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য।

মহাপ্রভু যখন এভাবেই নিজের মনের সঙ্গে বিচার করছেন তখন একদিন নবদ্বীপে এলেন সন্ন্যাসী কেশবভারতী। মহাপ্রভু তাঁকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ জানালেন। অনেক শাস্ত্র আলোচনা করার পর মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন, ইনিই তাঁর গুরু হওয়ার উপযুক্ত। এঁর কাছেই তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষা নেবেন। কেশব ভারতীকে তিনি গুরু হওয়ার জন্য তাঁর অন্তরের ইচ্ছার কথা জানালেন। কেশবভারতী জানতেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান' সুতরাং তিনি ভগবানের ইচ্ছাকেই স্বীকার করে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু হতে রাজী হলেন।

মাতা শচীদেবীর কাছ থেকে আগেই কৌশলে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে একদিন রাত্রে নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। পিছনে পড়ে রইলো স্নেহশীলা জননী শচীদেবী ও নব বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই হাঁটাপথে প্রথমে গেলেন কাঞ্চন নগরে। সেখানে কেশবভারতী সাগ্রহে তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্য-লীলা

যথাবিহিত গঙ্গাস্নান করে মুণ্ডিত মস্তকে গঙ্গার তীরে তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হলো। সন্ন্যাস-মন্ত্র নেওয়ার পর তার নাম দেওয়া হলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কেশব-ভারতী তাঁর অন্যান্য শিষ্যের মত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভারতী পদবী দেননি কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং যে রাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত কৃষ্ণস্বরূপ। সুতরাং তাঁর নাম রাখা হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দীক্ষা নেওয়ার পরই মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার মনস্থ করেন। 'কোথায় আমার প্রাণবল্লভ' 'কোথায় আমার দয়িত' বলে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তিনি বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথ-ঘাট ঠিক জানা না থাকায় এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়ায় তিনি ঠিক পথে না গিয়ে রাঢ় দেশে ঘুরতে লাগলেন। এদিকে নবদ্বীপ থেকে নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন আর মুকুন্দ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে রাঢ় দেশে এসে উপস্থিত হলেন।

এখানে নিত্যানন্দ কৌশলে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুকে গঙ্গার তীরে নিয়ে এলেন। তারপর একটি নৌকায় চেপে তাঁরা শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আচার্য্য-রত্নকে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো যাতে তিনি তাঁকে সব খবর জানিয়ে দিতে পারেন। এরপর নিত্যানন্দ ও অন্যান্যরা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এসে হাজির হলেন।

এখানে নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর সঙ্গে একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বালকদের কাছে বৃন্দাবনের পথ জানতে চাইলে তারা গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে দেখেন নিত্যানন্দ সেখানে হাজির। তিনি মহাপ্রভুকে বললেন যে তাঁর সঙ্গে তিনিও বৃন্দাবন যাবেন। কৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গকে গঙ্গা দেখিয়ে বললেন যে সেটাই যমুনা নদী। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভু মহানন্দে স্নান করে যমুনার স্তব করলেন। এই [illegible]ময়েই অদ্বৈত এসে

উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গে করে কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে এসেছেন। এইসব দেখে মহাপ্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান হলো—তিনি নিত্যানন্দের চাতুরি বুঝতে পারলেন। তিনি অবশ্য এর জন্যে কাউকেই কিছু বললেন না। সম্ভবতঃ নবদ্বীপের ভক্তদের এবং জননী শচীদেবীকে কিছু না বলে চলে আসাটা তাঁর অন্তরে বেদনার মত বাজছিল। অদ্বৈত আচার্য আনন্দিত চিত্ত হয়ে বললেন—

"আচার্য কহে—তুমি যাহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে—গঙ্গাতীরে তব আগমন॥"

মহাপ্রভু তিনদিন ধরে উপবাস করে আছেন। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। শুধু কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা বলেই দেহযন্ত্র সচল রয়েছে। অদ্বৈত সবিনয়ে বললেন—'প্রভু আমি একমুষ্টি অন্ন পাক করেছি। আজ আমার বাড়ীতে তুমি দয়া করে সেবা গ্রহণ কর।' প্রভুর সম্মতি পাওয়ার পর সবাই মিলে নৌকাযোগে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহের পানে যাত্রা করলেন। আচার্য-পত্নী সীতাদেবীর আজ আর আনন্দের সীমা নেই। তিনি সহস্তে বহু যত্নে মহাপ্রভুর জন্য অনেক প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ একসঙ্গে আহারে বসলেন, পরিতোষ সহকারে উভয়েই সেই অন্ন গ্রহণ করলেন। তাঁদের খাওয়ার পর অন্যান্য ভক্তরা প্রসাদ পেলেন।

বিশ্রামান্তে সন্ধ্যায় কীর্তন শুরু হলো। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য করলেন। নবদ্বীপ থেকে দলে দলে ভক্তেরা এলেন। অদ্বৈত গৃহে যেন মেলা বসে গেল। দোলায় চড়ে জননী শচীদেবী এলেন। মহাপ্রভুর মুণ্ডিত মস্তক, সন্ন্যাসীর বেশ দেখে জননী চোখের জলে বুক ভাসালেন। মহাপ্রভুও একান্ত বিকল হয়ে মাতৃ পাদ বন্দনা করলেন। শচী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"বাছা নিমাই, তুমি বিশ্বরূপের মত হয়ো না। সে সন্ন্যাসী হওয়ার পর আর আমায় দেখা দিল না। তুমি এরকম হয়ো না। তুমিও যদি তোমার দাদার মত কর, তবে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো।" জননীর এই করুণ দুঃখপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে অশ্রুজলে ভেসে মহাপ্রভু শচীকে উদ্দেশ করে বললেন—"মাগো!

তুমি এমন করে বলো না। তোমার নিমাই তো তোমারই অংশ। তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ, লালন-পালন করেছ। কোটি কোটি জন্মেও তোমার ঋণ শোধ করা যাবে না। আমি সন্ন্যাসী হলেও, তোমার প্রতি উদাসীন থাকবো না। আমি সন্ন্যাসী হলেও তোমার আজ্ঞা মতই চলবো। তুমি যা বলবে, আমি তাই পালন করবো।"

এই বলে মহাপ্রভু বারবার জননীর পদধূলি নিলেন। আনন্দিত চিত্তে জননী শচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘন ঘন আদর করলেন।

"কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিব সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নাহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥"

নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভুর একান্ত ভক্তেরা সবাই এসে জড় হয়েছেন। তিনি একে একে সবাইকেই সম্ভাষণ করে কুশল বার্তা নিলেন। চৈতন্যকে এই বেশে দেখে কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে নিজেদের মধ্যে আবার ফিরে পেয়ে সবাই আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন।

অদ্বৈত-গৃহ আবার কৃষ্ণ-বন্দনা, সংকীর্তনে মুখর হয়ে উঠলো। মহাপ্রভু ভক্তদের ডেকে বললেন—'দেখ, আমি সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবন চলে যাব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু তোমাদের কথা ভেবে, জননীর কথা ভেবে আবার তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি ঠিকই তবু তোমাদের আমি ভুলে যাব না এবং জননীকেও আমি ত্যাগ করবো না।'

"তোমা সবাকার আজ্ঞা বিনে চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্তন ॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নাহিব উদাস ॥
তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥"

দেখতে দেখতে দশদিন কেটে গেল। মহাপ্রভু এবার সবাইয়ের কাছে বিদায় চাইলেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কাল কাটান ভাল দেখায় না বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য জননীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হলেও শচীদেবী বললেন—'নিমাই যদি আমার কাছে থাকে তবে আমার চেয়ে আর সুখী কে। কিন্তু এতে যদি লোকনিন্দা হয় তবে আমি নিমাইকে থাকতে বলতে পারি না। বরং নিমাই যদি পুরীতে থাকে এবং মাঝে মাঝে এখানে গঙ্গাস্নানে আসে তবে আমি এবং সবাই নিমাইয়ের খবর পাব এবং দেখাও হবে।'

মহাপ্রভু সানন্দ চিত্তে মাতৃআজ্ঞা মেনে নিলেন। ঠিক হলো তিনি নীলাচলেই থাকবেন। মায়ের অনুমতি পেয়েছেন। নিমাই আর দেরী না করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ভক্তদের কাছে ডেকে বললেন—"যাও, তোমরা কৃষ্ণ-বন্দনা, সংকীর্তনের মধ্যে কাল কাটাও। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা যখন পুরীতে তীর্থ করতে যাবে তখন দেখা হবে আমার সঙ্গে এবং আমি যখন গঙ্গাস্নানে আসব তখন আবার দেখতে পাবে আমাকে।"

অদ্বৈত-গৃহে আবার কান্নার রোল উঠলো। মহাপ্রভু জননী শচীদেবী ও অন্যান্য ভক্তদের সান্ত্বনা দিলেন। ঠিক হলো চারজন ভক্ত প্রভুর সঙ্গে যাবেন। সেই অনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত আর মুকুন্দ দত্ত চললেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। ছত্রভোগের পথে তাঁরা নীলাচলের দিকে এগিয়ে চললেন।

প্রয়াগঘাট, জলেশ্বর পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন রেমুনায়। এই রেমুনায় প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির।

গোপীনাথকে দেখে মহাপ্রভুর ভাবের উদয় হলো তিনি প্রেমানন্দে নাচলেন ও নাম গান করলেন। বিগ্রহের সামনে যেই তিনি প্রণাম করলেন অমনি গোপীনাথের মাথার ফুলের চূড়া তাঁর মাথায় খসে পড়লো। তাই দেখে গোপীনাথের পূজারীরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা মহাসমাদরে মহাপ্রভুকে বার ভাণ্ড ক্ষীরভোগ এনে দিলেন। নিজে এবং সঙ্গীরা পাঁচটি ভাণ্ড রেখে বাকিগুলি মহাপ্রভু পূজারীকেই ফেরত দিয়ে দিলেন।

এই মন্দিরের বিগ্রহ গোপীনাথ ও মাধবেন্দ্রপুরীকে নিয়ে সুন্দর কাহিনী আছে। একবার মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুর থেকে ফেরার পথে রেমুনাতে যেয়ে গোপীনাথ দর্শন করলেন। সন্ধ্যায় দেখলেন পূজারীরা অনেকগুলি মৃৎপাত্রে অমৃতের মত সুগন্ধযুক্ত ক্ষীর যাকে অমৃৎকেলী বলা হোত তাই দিয়ে গোপীনাথকে ভোগ দিচ্ছেন। হঠাৎই মাধবেন্দ্রপুরীর মনে হোল তিনি যদি এই ক্ষীরভোগ আস্বাদন করতে পারতেন, তবে তিনি তাঁর গোপালের জন্য এরকম ভোগের ব্যবস্থা করে দিতেন।

যাই হোক পূজারতী শেষে পূজারী ঠাকুরকে শয়নে দিলেন। এদিকে মাধবেন্দ্রপুরী মন্দির থেকে একটু দূরে একটা কুটিরে নাম গান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। মধ্য রাত্রে পূজারী স্বপ্ন দেখলেন যে গোপীনাথ তাঁকে বলছেন—আমার পরমভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর আমার ক্ষীরভোগ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এক পাত্র ক্ষীর তাঁর জন্যে রেখে দিয়েছি। তুমি এই ক্ষীর নিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়ে এসো।

ভীত-কম্পিত তুরুতুরু বক্ষে সেই মধ্যরাত্রে পূজারী মন্দিরের দরজা খুললেন। সারা ঘর সৌরভে আমোদিত। গোপীনাথ যেন জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর পিছনেই এক ভাণ্ড অমৃৎকেলী। দেবতার চরণে আছড়ে পড়লেন পূজারী। তারপর সেই ক্ষীরভাণ্ড তিনি মাথায় করে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠ সর্বত্র আছড়ে পড়লো—

"কোথায় তুমি মাধবেন্দ্রপুরী, তোমার তরে গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরি।"

রেমুনা থেকে মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পুরীধামের দিকে চললেন। পথে যাজপুর পড়লো। যাজপুরের বরাহমন্দির দর্শন করে তাঁরা কটকে গেলেন, বিখ্যাত সাক্ষীগোপাল মন্দির দেখার জন্য। সাক্ষীগোপাল জাগ্রত দেবতা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পূর্বেই এই বিগ্রহ দর্শন করেছেন। এই মন্দিরের বিগ্রহ গোপাল সম্বন্ধে সুন্দর কাহিনী আছে।

কটকের কাছেই বিদ্যানগর নামে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামের দু'জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। একজন বয়সে প্রবীণ এবং বংশ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। অন্যজন যুবা পুরুষ এবং বংশগৌরবে কিছু হীন মর্যাদাসম্পন্ন। মহানন্দে দু'জন বৃন্দাবনে নানা দেব-দেবী দর্শন করে দিন কাটালেন। কিন্তু হঠাৎ প্রবীণ ব্রাহ্মণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন যুবক প্রাণ দিয়ে সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণের সেবা-যত্ন করলেন এবং তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। এতে সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে তিনি এই যুবকের হাতেই তাঁর কন্যাকে দান করবেন। যুবকটি কিন্তু বললেন যে তা হতে পারে না, কারণ সে নিজে হীন বংশজাত এবং প্রবীণ ব্রাহ্মণের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা এটা মেনে নেবেন না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে অটুট থাকলেন। তিনি যুবকটিকে নিয়ে বৃন্দাবনের শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর তাঁরা দেশে ফিরে গেলেন। দেশে ফেরার পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা শুনে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র সবাই খুবই ক্রুদ্ধ হলো। তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, তা অসম্ভব, কিছুতেই তা হতে পারে না।

এর কিছুদিন পরে ঐ ব্রাহ্মণ যুবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে এসে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। তাঁর কথা শুনে বৃদ্ধের আত্মীয়-স্বজন সবাই এলো তাকে মারতে। তখন যুবক নিরুপায় হয়ে গ্রাম-বাসীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এলো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবার চাপে পড়ে বললেন যে, তাঁর কিছু মনে নেই। তবে যুবকের কথামত যদি শ্রীগোপাল স্বয়ং এসে সাক্ষ্য দেন, তবে আর যুবককে কন্যা দিতে

তাঁর আপত্তি থাকবে না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ভেবেছিলেন এই অসম্ভব কথায় যুবক নিরস্ত হয়ে ফিরে যাবে।

কিন্তু এই যুবক ছিলেন নিষ্ঠাবান, সদাচারী এবং ঈশ্বরের পরম ভক্ত। তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না। তাই সবার সামনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলেদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি ঠাকুরের সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে রইলেন। ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দিলেন। ভক্তের কথায় তিনি সাক্ষ্য দিতে তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষী দিতে রাজি হলেন। তবে শর্ত রইলো যে এই রূপেই তিনি যুবকের পিছন পিছন বিদ্যানগর যাবেন। কিন্তু যুবক যদি কোন সময় পিছন ফিরে তাঁকে দেখেন, তবে তিনি সেখানেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন, গোপালের এই আশ্বাস বাণীতে আনন্দিত চিত্তে যুবক গ্রামের পথে ফিরে চললেন। মনের আনন্দে যুবক অগ্রসর হচ্ছেন, আর শুনছেন শ্রীগোপালের চরণের মধুর নূপুর-ধ্বনি। গ্রামের কাছে প্রায় এসে গেছেন, এবারে যুবকের ইচ্ছা হলো একবার শ্রীগোপালকে দর্শন করার। যেই তিনি ফিরে তাকালেন অমনি শ্রীগোপাল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। এবারে যুবক গিয়ে সব গ্রামবাসীদের ডেকে আনলেন।

বৃন্দাবনের শ্রীগোপালকে দেখে সবাই যুবক ব্রাহ্মণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও এবার আর যুবকের হাতে কন্যাদান করতে আপত্তি করলেন না। দুই ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের পূজারী নিযুক্ত হলেন। সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন বলে গোপালের নাম হলো সাক্ষীগোপাল।

এ ঘটনার অনেকদিন পরে উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব এই স্থান জয় করে ভক্তিভরে শ্রীগোপাল বিগ্রহ নিয়ে এলেন কটকে। মহাসমারোহে দেবতার প্রতিষ্ঠা করা হলো। সেই থেকে সাক্ষীগোপাল রয়ে গেলেন কটকেই!

সাক্ষীগোপাল দর্শন করে মহাপ্রভু সঙ্গীদের নিয়ে এবার পুরীধামের দিকে যাত্রা করলেন। পথের মধ্যে একটি জায়গায় নিত্যানন্দ প্রভু

মহাপ্রভুর দণ্ডটি ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর দণ্ড থাকে কিন্তু যিনি মহাপ্রভু, স্বয়ং ভগবান তাঁর দণ্ডের প্রয়োজন কি। মনে হয়, একারণেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। যাই হোক্ আঠারনালা বলে একটি জায়গায় পৌঁছে মহাপ্রভু জানলেন যে, তাঁর দণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। তিনি রাগ করে তাই সঙ্গীদের ছেড়ে একাই চললেন জগন্নাথ দর্শনে। মনে হয় মহাপ্রভু সদলে জগন্নাথ দর্শন না করে, একা একাই প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

মহাপ্রেমাবেশে প্রভু জগন্নাথ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে, জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করে তিনি ছুটে গেলেন তাঁকে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে তিনি মন্দির চত্বরেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর গৌরকান্তি অপরূপ রূপ ও প্রেমাবেশ দর্শনে সমবেত ভক্ত ও পূজারীরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। অন্যান্যদের মধ্যে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি মূর্ছিত মহাপ্রভুকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাপ্রভুর সঙ্গীরা মন্দিরে এসে পৌঁছলেন। এখানে এসে তাঁরা সব কথা শুনলেন। সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। তখন সবাই মিলে সার্বভৌমের গৃহে গমন করলেন।

অনেকক্ষণ পর মহাপ্রভু চেতনা ফিরে পেলেন। সঙ্গীদের দেখে তাঁর আনন্দ হলো। সার্বভৌম সবাইকে সেবা করিয়ে তাঁদের থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন। এদিকে গোপীনাথ আচার্য বলতে লাগলেন যে মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর এই কথা সার্বভৌম ও তাঁর ছাত্রেরা মেনে নিলেন না। তাঁরা মহাপ্রভুকে বিচার করে নেওয়া ঠিক করলেন।

একদিন সার্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁর টোলে বসে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনতে বললেন। তাঁর কথায় মহাপ্রভু রাজি হলেন। তিনি সাতদিন ধরে সার্বভৌমের টোলে তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনলেন। একদিন সার্বভৌম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর কেমন লাগছে। মহাপ্রভু সোজাসুজি বলে দিলেন যে "ব্যাসদেবের বেদা

সূত্রগুলি তিনি যেমন স্পষ্ট বুঝতে পারেন, সার্বভৌমের ব্যাখ্যা তেমন বুঝতে পারছেন না।”

এর কয়েকদিন পরে মহাপ্রভুর সঙ্গে সার্বভৌমের এক বিচারসভা বসলো। সার্বভৌম প্রথমেই শঙ্করের মায়াবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। মহাপ্রভু সহজ কথায়, অনায়াসে তার জবাব দিলেন। এরপর সার্বভৌম শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করতে বললেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকেই এর ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানালেন। তিনি নয় রকমে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন যে এর বেশী অর্থ স্বয়ং বৃহস্পতিও করতে পারবেন না।

মহাপ্রভু সার্বভৌমের অহমিকাবোধ দেখে মনে মনে হাসলেন ; কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি তখন সার্বভৌমের অর্থগুলি বাদ দিয়ে একে একে আরো আঠারো রকমের ব্যাখ্যা করলেন। মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেখে সার্বভৌম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জেনে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর ভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলাচলের পণ্ডিতসমাজ শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মহাপ্রভুর বন্দনা করলেন। দেখতে দেখতে নীলাচলেও নবদ্বীপের মত মহাপ্রভুর ভক্ত সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল।

নিত্য-নতুন ভক্ত সমাগমে, সংকীর্তন ও নাম-গানের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর দিন কেটে যাচ্ছে। স্বয়ং সার্বভৌম তাঁকে ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন। নীলাচলের পণ্ডিতসমাজ ও সাধারণ লোক সবাই দলে দলে এসে তাঁর পাদ-বন্দনা করছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই ভক্ত সমাগমে মহাপ্রভু ক্লান্তি অনুভব করলেন। তিনি আবার তীর্থ পরিক্রমায় বের হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এবার তিনি যেতে চান দক্ষিণ-ভারতে এবং একা যাওয়াই মনস্থ করলেন। ভক্তেরা বাধা দিলেন এমনকি নিত্যানন্দ সঙ্গে যেতে চাইলেন। শেষে ভক্তদের অনুরোধে মহাপ্রভু একজন সঙ্গী নিতে

রাজি হলেন। ঠিক হলো কৃষ্ণদাস নামে এক যুবক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রভু জগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁর অজ্ঞামালা নিয়ে মহাপ্রভু সমুদ্রতীর ধরে আলালনাথের পথে যাত্রা করলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুকে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরের শাসনকর্তা ছিলেন রামানন্দ রায়। তিনি ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব ও রসিক ভক্ত।

ভক্তদের ছেড়ে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের পথে চলেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণদাস। তাঁর গৌরবর্ণ রূপ ও কৃষ্ণ-প্রেম আর্তি দেখে বহু লোক তাঁর সঙ্গী হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে তাঁর সঙ্গে যেতে লাগল। যে পথ দিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে গেলেন, এভাবেই সে পথের পাশের গ্রামের লোকেদের মধ্যে তিনি হরিভক্তি বিলাতে বিলাতে অগ্রসর হলেন। পাপী, তাপী, সাধারণ দীন-দরিদ্র, সমাজের অবহেলিত সব মানুষই তাঁর হরিভক্তির প্রসাদ-কণা পেয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করল। এইভাবে যেতে যেতে মহাপ্রভু কুর্ম্মস্থানে যেয়ে পৌঁছলেন। এখানে বিগ্রহের সামনে বহুক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্য করলেন মহাপ্রভু।

মহাপ্রভুর মধ্যে দিব্যভাব দর্শন করে কুর্ম্ম-নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে বহু সেবা-যত্ন করে ভিক্ষা করালেন। বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ কুর্ম্মের বাড়ীতে এলেন মহাপ্রভুকে দেখতে। কিন্তু মহাপ্রভু চলে গিয়েছেন শুনে তিনি মাটিতে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তের আহ্বানে মহাপ্রভু সাড়া দিলেন। হঠাৎই মহাপ্রভু আবার কুর্ম্মের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এই ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভগবানের ছোঁয়ায় ভক্তের সব রোগ দূর হলো। মহাপ্রভু কিন্তু তাঁকে আলিঙ্গন করেই আবার যাত্রা শুরু করলেন। তখন দুই ভক্ত ব্রাহ্মণ কুর্ম্ম ও বাসুদেব দু'জন দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরে—"হা প্রভু, হা প্রভু" বলে কাঁদতে লাগলেন।

মহাপ্রভু এগিয়ে চললেন। এরপর তিনি জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে

গেলেন। এখানে প্রেমানন্দে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে স্তুতি বন্দনা করলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। নদী দেখে মহাপ্রভুর আনন্দ হলো। তিনি ঘাটে স্নান করে কিছু দূরে বসে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। এমন সময় বিদ্যানগরের শাসনকর্তা রামানন্দ রায় দোলায় চড়ে গোদাবরীতে স্নান করতে এলেন। তাঁর কথা আগেই সার্বভৌম প্রভুকে বলেছিলেন। প্রভু রামানন্দ রায়কে দেখলেন কিন্তু এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন না। তিনি প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম বন্দনা করতে লাগলেন। স্নান শেষে রামানন্দ এই অপরূপ গৌরকান্তি নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। মহাপ্রভুও মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। দু'জনের দেহে ও মনে মহাভাবের তরঙ্গ খেলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভাবতন্ময়তা কাটিয়ে তাঁরা উঠে বসলেন। মহাপ্রভু বললেন যে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তাঁর কথা শুনেছেন। রামানন্দ রায় মহাপণ্ডিত ও কৃষ্ণভক্ত। মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাঁর মধ্যে দিব্যভাব দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। নিজের দীনতা প্রকাশ করে তিনি বলতে লাগলেন—"আমি রাজকর্মচারী, বিষয়ী, অধম ও শূদ্র আর তুমি স্বয়ং ভগবান এসেছ আমায় উদ্ধার করতে। তুমি দয়াময় পতিতপাবন, আমাকে দয়া কর, আমাকে উদ্ধার কর।"

"কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন।"

এই সময় এক ব্রাহ্মণ এসে প্রভুকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রভু তাঁর গৃহে যেতে সম্মত হলেন। ঠিক হলো সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় সেই ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবেন। সন্ধ্যাবেলা রামানন্দ, মহাপ্রভু যে গৃহে আতিথ্য নিয়েছেন সেখানে গেলেন। প্রভু, রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেম ও সাধনতত্ত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা

করলেন। তাঁদের আলোচনা শুরু হলো সাধ্য-সাধন বিষয় নিয়ে অর্থাৎ আলোচনার বিষয়বস্তু হলো সাধনাই বা কেমন আর সাধনার ধনই বা কেমন—তাই নিয়ে।

এসব গূঢ় তত্ত্ব মহাপ্রভু কিন্তু রামানন্দের মুখ থেকেই শুনতে চাইলেন। রামানন্দও ধীরে ধীরে সাধ্য-সাধন বিষয়ে নানাকথা বললেন।

রামানন্দের সহজ সরল ব্যাখ্যায় মহাপ্রভু খুবই আনন্দিত হলেন। এরপর তিনি প্রেমের চরম পরিণতি অর্থাৎ প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের একাত্মভাবের কথা বললেন। রামানন্দের কৃষ্ণ-প্রেমের গাঢ়তা ও গভীরতা দেখে মহাপ্রভু খুবই খুশী হলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মহাপ্রভু রামানন্দের সঙ্গে এভাবেই কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-প্রেমের আলোচনায় দিন কাটাতে লাগলেন। এই আলোচনার মধ্যেই রামানন্দ মহাপ্রভুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ দেখতে পেলেন। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

"দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে।"

এভাবেই দেখতে দেখতে দশদিন কেটে গেল। মহাপ্রভু এবার রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। দুঃখে বেদনায় রামানন্দ কাতর হয়ে পড়লে মহাপ্রভু তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন—"তুমি রাজকর্ম ছেড়ে নীলাচলে চলে যাও। আমি তীর্থ ভ্রমণ শেষে নীলাচলে ফিরে আসবো। এবং সেখানে কৃষ্ণ-বন্দনা ও কৃষ্ণ-কথায় আমরা কাল কাটাব।"

"আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে ॥

এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥”

বিদ্যানগর থেকে মহাপ্রভু আরো দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেন। যাত্রাপথে সমস্ত মানুষের কাছে কৃষ্ণ-প্রেম বিলাতে বিলাতে অগ্রসর হলেন। যাত্রাপথে বহুলোক মহাপ্রভুর সঙ্গী হলেন এবং তাঁর সঙ্গে পদযাত্রা করলেন। এইভাবে নানা তীর্থ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু রামেশ্বর সেতুবন্ধে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে ধর্মতীর্থে স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করলেন তিনি।

রামেশ্বর থেকে তিনি ঠিক করলেন যে, অন্যপথ ধরে ফিরে আসবেন। সেইমত অন্যপথ দিয়ে ফেরার সময়ও অনেক তীর্থ দর্শন হলো এবং অনেক লোকও তাঁর ভক্ত হলেন। পথে অনেক ঘটনাও ঘটলো।

এক জায়গায় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর বিচারসভা বসলো। তারা তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করলো; কিন্তু শেষে মহাপ্রভুর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তারা তাঁর কাছে মাথা নত করলো।

মহাপ্রভু আরো এগিয়ে গেলেন। রঙ্গনাথে গিয়ে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন। এখানে বেঙ্কটভট্ট নামে এক সরল প্রাণ বৈষ্ণব ভক্তের গৃহে তিনি উঠলেন। প্রতিদিন বহুলোক তাঁর কাছে আসতে লাগলেন এবং অনেক লোক তাঁর শিষ্য হলেন। এঁদের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা আলোচনা, সংকীর্তন ও কৃষ্ণ-বন্দনায় তাঁর দিন কাটতে লাগলো, এভাবেই দেখতে দেখতে চার মাস কেটে গেল।

এখানে এক সরলপ্রাণ কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে গীতাপাঠ করেন এবং চোখের জলে ভাসেন। তাঁর পাঠ সঠিক নয়, উচ্চারণ ভুল অথচ কেন তিনি চোখের জলে ভাসেন এটা জানার খুব ইচ্ছা হলো মহাপ্রভুর। মহাপ্রভু তাঁকে প্রশ্ন করে বুঝতে পারলেন যে তিনি গীতার অর্থ কিছুই বোঝেন না। তবে যতক্ষণ গীতাপাঠ করেন ততক্ষণ তিনি যেন তাঁর চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মূর্তি দেখতে পান, এবং এ কারণেই তিনি চোখের জলে ভাসেন। মহাপ্রভু বুঝলেন ইনি পরমভক্ত। তাঁরই গীতা পাঠ সার্থক।

তিনি সবাইকে একথা বললেন এবং শুদ্ধ ভাবে গীতা পাঠের নিয়ম এই ব্রাহ্মণকে বলে দিলেন।

এবার তিনি আবার যাত্রা করলেন। পথে পরমানন্দপুরী গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। আরো অগ্রসর হওয়ার পর এক জায়গায় ভট্টমারি নামে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এরা দুষ্ট প্রকৃতির। নারীর প্রলোভন দেখিয়ে তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল। মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসের প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু নিজে গিয়ে কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করে আনলেন। ভট্টমারিরা মহাপ্রভুকে প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন তারা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেল তখন তারা নিজেরাই তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়াল।

এরপর মহাপ্রভু পাণ্ডবপুর বলে একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছালেন। এখানে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এঁর কাছেই তিনি তাঁর বড় ভাই বিশ্বরূপের খবর পেলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে শঙ্করারণ্য নাম নিয়েছিলেন। তবে তিনি আর বেঁচে নেই তাঁর দেহ-ভোগ শেষ হয়েছে। বিশ্বরূপের খবর পেয়ে তিনি শান্তিলাভ করলেন।

দেখতে দেখতে তাঁর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই যাত্রায় তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দু'খানি পুঁথি সংগ্রহ করলেন। আবার বিদ্যানগরে ফিরে এলেন। এখানে সাতদিন বিশ্রাম নিলেন। কৃষ্ণ সংকীর্তন, কৃষ্ণ-বন্দনায়, ভক্ত সমাগমে এই সাতদিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এখান থেকে তিনি পুরীর পথে ফিরে চললেন। এবারে রামানন্দও তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা শুরু করেছেন।

পুরীধামে ফিরে এলেন মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, গোপীনাথ ও অন্যান্য ভক্তদের একে একে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন মহাপ্রভু। ভক্তেরা চোখের জলে ভেসে পাদ-পদ্ম বন্দনা করে এই মহামিলনকে সার্থক করে তুললেন। কীর্তনে, কৃষ্ণ-বন্দনায় পুরীধাম আবার মুখরিত হয়ে উঠলো। সারা নীলাচল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেল।

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণে কাল কাটাচ্ছিলেন তখন সার্বভৌম নীলাচলের রাজা প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর নানা অলৌকিক

মহত্ত্বের কথা শোনান। রাজা প্রতাপরুদ্র তাতে মহাপ্রভুর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

একদিন মহাপ্রভুর বিশ্রাম সময়ে সার্বভৌম মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নানা গুণের কথা উল্লেখ করে বললেন যে মহারাজ মহাপ্রভুর পরম ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চান তিনি। মহাপ্রভু মহারাজের ভক্তির কথা শুনে মনে মনে খুবই প্রসন্ন হন। কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলনে তিনি রাজী হন না। সার্বভৌম এতে মনে দুঃখ পান এবং মহারাজ খুবই ব্যাকুল হয়ে ভেঙ্গে পড়েন। রামানন্দ রায়কে দুঃখ করে বলেন :

"আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন।"

কিছুদিন পরে নবদ্বীপ থেকে অদ্বৈত, হরিদাস ইত্যাদি ভক্তেরা নীলাচলে এসে উপস্থিত হন। রামানন্দ রায়ও রাজকার্য পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে পুরীধামে এসে উপস্থিত হলেন।

সবার সঙ্গ লাভ করে মহাপ্রভুর মন ভাব-বিহ্বলতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিছুদিন পরেই রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সাত দিনের জন্য গুণ্ডিচা মন্দিরে যান। এবারে মহাপ্রভু নিজেই তাঁর ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা মনস্থ করলেন। তাঁরা সবাই মন্দিরটি এমন ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুললেন যেন মনে হলো এই মন্দিরে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব ঘটেছে।

এদিকে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত না হওয়ার দুঃখে রাজা প্রতাপরুদ্র একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন।

"তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥"

রাজার মনের এই ভাব দেখে সার্বভৌম খুবই চিন্তিত হলেন। তারপর রাজাকে তিনি একটি উপায়ের কথা বললেন। রাজা এই যুক্তি মেনে নিলেন।

রথযাত্রার নির্দিষ্ট দিনে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করে চলেছেন। মহাপ্রভুও নিজ ভক্তদের নিয়ে কীর্তন করতে করতে রথের সঙ্গেই যাত্রা করলেন। প্রেমাবশে প্রভুর দেহে নানা বিকার দেখা দিল। সমবেত ভক্তমণ্ডলী এই দিব্য ভাব দর্শন করে চোখের জলে বুক ভাসালেন।

বলগণ্ডিতে উদ্যানের ভিতর মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণব-ভক্তেরা সবাই প্রভুর পাদ-বন্দনা করতে লাগলেন। সার্বভৌমের যুক্তি মত রাজা প্রতাপরুদ্রও বৈষ্ণব ভক্তের বেশে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন। প্রভুও তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন। ভগবানের কাছে ভক্ত ধরা দিলেন তাই ভগবানও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আসলে মহাপ্রভু রাজবেশে রাজা প্রতাপরুদ্রকে গ্রহণ করতে সম্মত হননি কিন্তু তিনি যখন রাজবেশ পরিত্যাগ করে দীন বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করলেন, তখন মহাপ্রভুও তাকে সহজেই কোল দিলেন। ওখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ দেওয়া হলো। ভোগশেষে জগন্নাথের রথ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভক্তেরা ভয়ে, 'অমঙ্গল' আশঙ্কায় কেঁদে ফেললো। চারিদিকে হৈ-চৈ। অবশেষে ভক্তদের অনুরোধে মহাপ্রভু নিজ মাথায় রথ ঠেললেন। অমনি রথের চাকা ঘড়ঘড়িয়ে চলতে লাগলো।

রথযাত্রার উৎসব শেষে নবদ্বীপের ভক্তরা মহাপ্রভুর কাছে বিদায় নিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসের হাত দিয়ে জননীর জন্য মহাপ্রসাদ ও বস্ত্রাদি পাঠিয়ে দিলেন। এরপর একদিন সার্বভৌমের গৃহে মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন হলো। সার্বভৌমের স্ত্রী মহানন্দে মহাপ্রভুর জন্য নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে প্রভুর জন্যে ভোগ সাজালেন। তিনি খেতে বসেছেন। এমন সময় সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। মহাপ্রভুকে দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জনের স্তূপ দেখে স্বভাব নিন্দুক অমোঘ বলে উঠলো—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥"

অর্থাৎ যে খাবার দশ-বার জন লোকের আহার তা একজন সন্ন্যাসী ভোজন করে। অমোঘের মুখে এই কথা শুনে সার্বভৌম ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন। অমোঘ তখনকার মত পালিয়ে গেল। কিন্তু সেই রাত্রেই অমোঘের কলেরা হল। মহাপ্রভু গোপীনাথ আচার্যের কাছে শুনলেন যে অমোঘের অপরাধে সার্বভৌম এবং তাঁর স্ত্রী উপবাস করে আছেন এবং অমোঘের কলেরা হয়েছে। মহাপ্রভু স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হলেন এবং অমোঘের বুকে হতে দিয়ে বললেন—'অমোঘ ওঠ, কৃষ্ণনাম নাও, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।' অমোঘ তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে আরোগ্যলাভ করে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হল। তিনি তখন সার্বভৌমকে বললেন, অমোঘ ছেলেমানুষ ওর জন্যে তিনি দুঃখিত হননি, সার্বভৌম যেন ওকে ক্ষমা করেন। ভক্তজনের প্রতি মহাপ্রভুর করুণা দর্শনে সবাই অভিভূত হলেন।

অনেকদিন হলো নীলাচলে রয়েছেন। সুতরাং মহাপ্রভু আবার তীর্থ-দর্শনে বের হওয়ার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর ইচ্ছা হলো বৃন্দাবন যাওয়ার। বিজয়াদশমীর দিন প্রভু রামানন্দ, গদাধর ও আরো কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। এবার তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি গৌড় হয়ে যাবেন। যাতে জননী শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং গঙ্গাস্নান করা যায়। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে জননী শচীদেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হলো। দীর্ঘদিন অদর্শনের পর জননী পুত্র মুখ দর্শন করে অপার আনন্দ পেলেন। দু'জনেই আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। এখানে সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথ এসে তাঁর পাদ-বন্দনা করলেন। রঘুনাথ যাতে গৃহত্যাগ না করতে পারেন, তার জন্য এগারো জন প্রহরী সবসময় তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখতো। মহাপ্রভু তাঁকে আরো কিছুকাল অনাসক্ত ভাবে সংসারের মধ্যে থেকে কৃষ্ণ-ভজনা করার উপদেশ দিলেন। রঘুনাথের মনে সান্ত্বনা

দিয়ে তিনি জননী ও অন্যান্য ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার নীলাচলে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। ঠিক হলো বর্ষার চারমাস নীলাচলে কাটিয়ে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করবেন।

শরৎকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনের পথে রওনা দিলেন। বহুল প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে বনপথে যাওয়াই তিনি মনস্থ করলেন। পথের মধ্যে হিংস্র পশুরাও তাঁর আগমনে তাদের হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ করে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনুগমন করলো। এই দৃশ্য দেখে মহাপ্রভুর সঙ্গীরা অবাক হয়ে গেলেন। এমনি করে পথ চলতে চলতে একসময় তাঁরা কাশীধামে এসে উপস্থিত হলেন।

এখানে অনেক পুরনো ভক্তের সঙ্গে দেখা হলো। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করছেন এমন সময় তপন মিশ্র এসে তাঁর পাদ-বন্দনা করলেন। কতদিন পড়ে উভয়ের দেখা হলো। উভয়েই বেশ আনন্দিত হলেন। স্নান শেষে মহাপ্রভু ও সঙ্গীরা বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করলেন। এরপর সবাই মিলে তপন মিশ্রের বাড়ী গেলেন। খবর পেয়ে মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত চন্দ্রশেখর এসে উপস্থিত হলেন। উভয়েই প্রভুর সেবায় রত হলেন। আস্তে আস্তে খবর ছড়িয়ে পড়লো। ভক্ত সমাগমে তপন মিশ্রের গৃহ পূর্ণ হয়ে উঠলো। কৃষ্ণ-বন্দনা, সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো বিশ্বনাথ ক্ষেত্র।

এই সময় প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাশীধামে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন প্রেমভক্তি উপাসনার বিরোধী। ভক্তদের মুখে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-ভক্তি, ভাবোন্মাদনার কথা শুনে তিনি অবাক হলেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের কাছে এই ভক্তিবাদের তিনি খুব নিন্দা করলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভু কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে মথুরায় গেলেন। এখান থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান শেষ করে, সঙ্গীদের নিয়ে দ্বাদশ বন পরিক্রমা করলেন। তাঁর আগমনে বৃন্দাবনের সর্বত্র

ভাবোল্লাস দেখা দিল। গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুলের সুবাসে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠলো। স্বয়ং কৃষ্ণ যেন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন। ধেনু বৎস সব মহাপ্রভুর গা চাটতে চাটতে তাঁর সঙ্গে চললো। প্রভু নিজে কখনও হরিণের গলা জড়িয়ে ধরলেন, কখনও তরুলতাকে আলিঙ্গন দিলেন। প্রভুর এই দিব্যভাব দর্শনে তাঁর ভক্তরাও ব্যাকুল হয়ে কেঁদে ভাসালেন।

শুকশারীর মুখে রাধাকৃষ্ণের গুণগান শুনে মহাপ্রভুর মধ্যে ভাব তন্ময়তা দেখা দিল। তিনি নিজেই কৃষ্ণ-বন্দনা শুরু করে দিলেন। ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কৃষ্ণ-বন্দনায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। বৃন্দাবন জুড়ে প্রেমসিন্ধু যেন উথলে উঠলো।

বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভু ফিরে এলেন মথুরায়। কিছুদিন এখানে কাটিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি প্রয়াগের পথে রওনা হলেন! পথিমধ্যে প্রেমাবেশে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সেই পথ দিয়ে এক পাঠান সর্দার সৈন্যদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে পথের সর্বত্রই ডাকাতদের খুব অত্যাচার হতো। মহাপ্রভুর সুন্দর চেহারা দেখে পাঠান সর্দার ভাবলেন যে, সঙ্গীরা তাঁকে অজ্ঞান করে তাঁর সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং মহাপ্রভুর সঙ্গীদের ডাকাত ভেবে পাঠান সর্দারের সৈন্যরা তাঁদের বেঁধে ফেললো। সবাই নিরুপায় হয়ে প্রভুর মূর্ছাভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর চৈতন্য ফিরে এলে তিনি পাঠান সর্দারকে সবকিছু খুলে বললেন। তাঁর সঙ্গে সর্দারের অনেক আলাপ-আলোচনা হল। তাঁর কথায় সর্দার ও তাঁর সঙ্গীরা সবাই অভিভূত হলেন এবং তাঁরা সবাই কৃষ্ণভক্ত হয়ে গেলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু এগিয়ে চললেন। তারপর সবাই ত্রিবেণীতে এসে পেঁাছালেন।

মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে যান সেই সময় তিনি গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে রূপ ও সনাতনের সাক্ষাৎ ঘটে। এঁরা দু'জনেই ছিলেন বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান কর্মচারী। এদের উপাধি ছিল সাকরমল্লিক ও দবীরখাস।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পেয়ে দু'জনেই সংসার ত্যাগ করে

মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হলেন। একসঙ্গে উভয়েই যদি রাজকার্য পরিত্যাগ করেন তাহলে নবাবের সন্দেহ হবে ভেবে প্রথমে রূপ যাওয়াই মনস্থ করলেন।

শুভদিন দেখে রূপ ও তাঁর ছোট ভাই অনুপম সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন। সংসার ত্যাগের আগে তাঁরা তাঁদের সঞ্চিত টাকাকড়ি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

এদিকে সনাতন প্রচার করে দিলেন যে তিনি অসুস্থ। এই উপলক্ষে তিনি রাজকার্য থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর মন পড়ে রইলো মহাপ্রভুর কাছে। গুপ্তচর মারফত হুসেন শাহ সব খবর জানতে পারলেন। তিনি সনাতনকে কারাগারে পাঠালেন। এই সময় উড়িষ্যায় গণ্ডগোল হওয়ায় বাদশাকে উড়িষ্যায় যেতে হলো।

রূপ ও অনুপম পদব্রজে চলেছেন বৃন্দাবনে। বিলাস ও বৈভবের মধ্যে দিন কাটালেও মহাপ্রভুর টানে রিক্ত হস্তে চলেছেন তাঁরা। মুখে কৃষ্ণ-নাম, অন্তরে শুধু একটাই ইচ্ছা গুণ গুণ সুরে বাজছে, কবে প্রভুর সঙ্গে মিলন হবে। একসময় যাত্রা শেষ হয়। প্রয়াগে পৌঁছে তাঁরা মহাপ্রভুর দেখা পেলেন। মহাপ্রভু সাদরে তাঁদের আলিঙ্গন দান করলেন।

মহাপ্রভু একান্তে রূপকে ভক্তি-রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তারপর তাঁকে বৃন্দাবন যেতে আজ্ঞা দিলেন। নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন বৃন্দাবন গিয়ে এইসব রসতত্ত্ব নিয়ে 'রসামৃতসিন্ধু' রচনা করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে মহানন্দে দশদিন কাটিয়ে রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন।

রূপকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে মহাপ্রভু আবার কাশীতে ফিরে গেলেন। এদিকে গৌড়ের কারাগারে মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করছেন সনাতন। তিনি বুঝতে পারলেন, হুসেন শাহের অবর্তমানে তিনি যদি পালাতে পারেন তবেই তাঁর যাওয়া সম্ভব হবে। নবাব ফিরে এলে আর তিনি মুক্তি পাবেন না। নানাভাবে তিনি কারারক্ষককে বশ করার চেষ্টা

করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কারারক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা দিয়ে বশ করে তিনি পালাতে সক্ষম হলেন। ভৃত্য ঈশানও প্রভুর সঙ্গে গেল।

গোপনে গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা নীলাচলের পথ ধরলেন। পথের এক জায়গায় সনাতন জানতে পারলেন যে ভৃত্য ঈশানের কাছে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। এতে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। সেই সাতটি স্বর্ণমুদ্রা তিনি এক ঘাটোয়ালকে দিয়ে দিলেন এবং ঈশানকে বিদায় দিয়ে একাকী অগ্রসর হলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি হাজিপুরে এসে পৌঁছলেন।

হাজিপুরের শাসনকর্তা ছিলেন সনাতনের ভগ্নীপতি। তিনি সব শুনে খুব সাবধানে সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিলেন।

একা একা পদব্রজে সনাতন ছুটে চললেন। পথের অজস্র দুঃখকষ্ট সহ্য করে অবশেষে তিনি কাশীতে এসে পৌঁছলেন। মহাপ্রভুর কাছে তাঁর আগমন সংবাদ পৌঁছাল। তাঁর স্নান ও ক্ষৌরকর্মের ব্যবস্থা হল। তপন মিশ্র তাঁর জন্যে নতুন বস্ত্র নিয়ে এলেন। এই বস্ত্র দিয়ে সনাতন কৌপীন ও বহির্বাস তৈরী করলেন। তারপর মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। প্রভু তাঁকে সাদরে বরণ করে তাঁকে আলিঙ্গন দান করলেন। একদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সনাতন তাঁর শেষ সম্বল ভোট কম্বলটি এক ভিখারীকে দিয়ে এলেন। এটি হাজিপুরে তাঁর ভগ্নিপতি তাঁকে দিয়েছিলেন। এতদিন পরে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করলেন। সনাতনের এই দৈন্য ও ভোগবিতৃষ্ণা দেখে মহাপ্রভু খুবই খুশী হলেন।

সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা হল। প্রভু মহানন্দে জীব, রাধাকৃষ্ণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা সনাতনকে বললেন। দীর্ঘ দু'মাস ধরে প্রেম, ভাব, শৃঙ্গার রস, রাধা-কৃষ্ণ-নিত্য-লীলা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সর্বত্র মহাপ্রভুর নিন্দা করে বেড়ান

দেখে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের মনে খুবই দুঃখ হল। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-ভক্ত একদিন সব সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ জানালেন। মহাপ্রভুও সেখানে যাবেন বলে তাঁকে কথা দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন। তিনি গিয়ে একটু নীচু জায়গায় আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর গৌরবর্ণ, উজ্জ্বলকান্তি দেখে সভার সমবেত অতিথিরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই সসম্মানে মহাপ্রভুকে সভার মধ্যখানে এনে বসালেন।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তিনি বেদান্ত পাঠ না করে সবসময় কৃষ্ণ-কীর্তন, কৃষ্ণ নাম-গানে মেতে থাকেন। মহাপ্রভু বিনয় করে বললেন যে, তাঁর গুরু তাঁকে বলে দিয়েছেন যে কৃষ্ণপ্রেমই আসল। মোক্ষলাভ ইত্যাদি কৃষ্ণপ্রেমের কাছে একান্তই তুচ্ছ। কৃষ্ণপ্রেম-ভাবনায় মতি হলেই জীবের উদ্ধার। এতেই জীবের মুক্তি। সহজ কথায় মহাপ্রভু বৈষ্ণবদের এই সাধনতত্ত্ব এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যাতে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, হৃদয়ের পরিপূর্ণতাবোধকে সবার মন স্পর্শ করল। সমবেত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা নূতন করে ভাবতে বসলেন। শেষে তাঁরা বললেন—"আচ্ছা, আপনি কৃষ্ণ-নাম করেন ভালকথা, কিন্তু বেদান্ত পাঠ করেন না কেন?" মহাপ্রভু তখন সকলকে সহজভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, বেদান্তে যা কিছু আছে, তাই আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সবাই মোহিত হয়ে গেলেন। তাঁদের মন ফিরে গেল। সবাই 'কৃষ্ণ' নামে পাগল হয়ে গেলেন। সারা কাশীধামে প্রেমের বন্যা বয়ে গেল। সবাই নাম-সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। কাশী যেন দ্বিতীয় নদীয়া নগর হয়ে উঠলো।

"সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্তন।
প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করয়ে নর্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার॥

নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥"

কাশীধামে প্রেম-ধর্ম বিতরণ শেষ হয়েছে। মহাপ্রভু এবার নীলাচলে ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ সবাই প্রভুর সঙ্গে আসতে চাইলেন। মহাপ্রভু কিন্তু একা একা ঝাড়খণ্ডের পথ দিয়ে পুরীধামে ফেরা মনস্থ করলেন। সবাইকে ডেকে বললেন যে, তাঁরা যদি নীলাচলে যেতে চান তবে সবাইকেই তাঁর পিছনে পিছনে আসতে হবে, তিনি সঙ্গে কাউকেই নেবেন না।

সনাতনকে ডেকে বললেন যে, তিনি যেন বৃন্দাবন চলে যান। সেখানে তাঁর আরো দুই ভাই আছেন। সবাই মিলে যেন বৈষ্ণবদের আগলিয়ে রাখেন।

মহাপ্রভু পদব্রজে পুরীধামের পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী বলভদ্র। আঠারনালায় পৌঁছে পুরীতে ভক্তদের কাছে তাঁর আগমন বার্তা জানালেন। সমস্ত ভক্তরা যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। তাঁরা সবাই নরেন্দ্র সরোবরের কাছে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। সব ভক্তরা আবার আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন।

"আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সব লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥"

তৃতীয় পর্ব

অন্ত-লীলা

মহাপ্রভুর নীলাচলে পৌঁছবার সংবাদ গৌড়ে পৌঁছালে, গৌড় থেকে ভক্তেরা মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য পুরীধামের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা যখন নীলাচলে এসে পৌঁছালেন তখন বৃন্দাবন থেকে রূপ গোস্বামীও এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। শাস্ত্র-আলোচনা,

নাম-সংকীর্তন ও কৃষ্ণ-নাম বন্দনায় তাঁদের দিন কাটতে লাগলো। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে বসে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে দু'খানি নাটক রচনা করেছিলেন। একদিন হরিদাসের বাসায় মহাপ্রভু, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম প্রমুখ ভক্তের সঙ্গে বসে নাটক দু'টি শুনলেন। সবাই নাটক দু'টির খুবই প্রশংসা করলেন। কিছুদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে আনন্দে অতিবাহিত করে গৌড়ের ভক্তেরা গৌড়ে ফিরে গেলেন। রূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশে আরও কিছুদিন নীলাচলেই রয়ে গেলেন।

এর মধ্যেই পুরীধামে একটা ঘটনা ঘটলো। মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্য শিখি মাইতির বোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে চাল ভিক্ষা করে এনেছিলেন। মাধবী দাসী ছিলেন বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। কিন্তু মাধবী দাসী যেহেতু স্ত্রীলোক সুতরাং মহাপ্রভু হরিদাসের উপর খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে জন্মের মত ত্যাগ করলেন। আসলে বৈরাগী হয়ে নারী সম্ভাষণ গুরুতর অপরাধ। লোকশিক্ষার জন্য এবং ভক্তদের মধ্যে সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত পালনের জন্য তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আসলে মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তেরা রাধা-কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা কঠোর সংযম পালন করতেন।

এই সময় একদিন বৃন্দাবন থেকে সনাতন পুরীধামে এসে উপস্থিত হলেন। পদব্রজে অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁকে আসতে হয়েছে। পথের মধ্যে নোংরা জলে স্নান করে তাঁর সারা দেহ খোস ও অন্যান্য চর্ম রোগে ভরে গিয়েছিল। সনাতন ভাবলেন, তাঁর কোন পাপের ফলে এই অবস্থা হয়েছে এবং এই পাপী শরীর তিনি জগন্নাথের রথের চাকার তলায় বিসর্জন দিতে মনস্থ করলেন। লোকমুখে সব শুনে স্বয়ং মহাপ্রভু সনাতনের বাসায় এলেন একদিন। সনাতনের মনের ইচ্ছা জেনে তিনি সনাতনকে এরকম চিন্তা করতে বারণ করলেন। বললেন, তাঁর দেহের উপর তাঁর নিজের কোন অধিকার নেই, সেটা তিনি আগেই মহাপ্রভুকেই সঁপে দিয়েছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর নির্দেশ ছাড়া এরকম কাজ তিনি করতে পারেন না।

এর কয়েকদিন পরে একদিন সনাতন সোজা পথ ছেড়ে সমুদ্র তীরের তপ্ত বালুকাময় পথে প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মহাপ্রভু এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে তাঁর অপবিত্র দেহ যদি জগন্নাথ-সেবকদের গায়ে লাগে এই ভয়ে তিনি এই পথে এসেছেন। ভক্তের বেদনা ভগবান উপলব্ধি করলেন। মহাপ্রভু সনাতনের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর অঙ্গস্পর্শে সনাতনের দেহের কণ্ডু-রসা সব রোগ দূর হয়ে গেল। সনাতন এরপর এক বৎসর শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কাছে কাল কাটালেন। রাধা-কৃষ্ণের লীলামৃত মাধুরীর নানা স্বরূপ তাঁকে যত্ন করে শেখালেন মহাপ্রভু। এক বৎসর পরে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্ম বন্দনা করে তিনি বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহাপ্রভুর ভক্তেরা সব পুরীধামে এসে মিলিত হন। তাঁদের নিয়ে কৃষ্ণ-লীলামৃত আস্বাদন করে মহাপ্রভুর দিন কাটে। এর মধ্যে একদিন সপ্তগ্রাম থেকে রঘুনাথ দাস এসে পৌঁছলেন শ্রীক্ষেত্রে। মহাপ্রভুর নির্দেশ মত রঘুনাথ সংসারে থেকেও আসক্তিশূন্য হয়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন। রঘুনাথ সেইমত চলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন।

সপ্তগ্রামের মুসলমান জমিদারের সঙ্গে রঘুনাথের পিতা হিরণ্যদাসের বিরোধ দেখা দেয়। হিরণ্যদাসের জমিদারী কেড়ে নেওয়ার জন্য তিনি গৌড় থেকে উজীরকে ডেকে আনেন। হিরণ্যদাস পালিয়ে যান, কিন্তু রঘুনাথ কারারুদ্ধ হন। এদিকে রঘুনাথ জমিদারের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। রঘুনাথের মিষ্ট কথায় জমিদারের মন সন্তুষ্ট হয় এবং তিনি উজীরকে বলে রঘুনাথকে কারামুক্ত করেন। রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্যও তাঁদের জমিদারী ফিরে পান।

রঘুনাথের এই সফলতায় তাঁর পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই খুব খুশী হন এবং রঘুনাথ যাতে আরো বেশী করে সাংসারিক ব্যাপারে মন দেয় তার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু রঘুনাথের বৈরাগ্য বেড়েই চলে। ধনী গৃহের আমোদ-প্রমোদ, সুন্দরী স্ত্রী কোন কিছুতেই তার মন শান্ত হয়

না। শেষ পর্যন্ত পুত্রের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করার জন্য তারা রঘুনাথকে পানিহাটি যাওয়ার অনুমতি দেন। রঘুনাথ সেখানে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে রঘুনাথ এক বিরাট চিড়া-মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। নিত্যানন্দ প্রভু আশীর্বাদ করে বললেন যে, শীঘ্রই তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় পাবেন। আনন্দিত চিত্ত হয়ে রঘুনাথ সপ্তগ্রামে ফিরে আসেন।

এরপর রঘুনাথ একদিন দেবীমণ্ডপে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় শেষ রাত্রিতে হঠাৎ জেগে দেখেন যে তাঁদের কুলপুরোহিত যদুনন্দনাচার্য উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি অবাক হন। প্রহরীরা সব ঘুমিয়ে আছে। যদুনন্দন বলেন যে ঠাকুরের পুজারী, ঠাকুরের সেবা ছেড়ে চলে গেছেন, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি রঘুনাথকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন।

এক মুহূর্তেই রঘুনাথ যেন তাঁর পথ খুঁজে পান। মনে মনে তিনি গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। এরপর রঘুনাথ কুলপুরোহিতের পিছনে পিছনে পূজারীর বাড়ীর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ পূর্বদিকে সরে পড়েন। কিছুদূর যাওয়ার পর আচার্য দেখেন যে রঘুনাথ নেই। প্রতিদিন প্রভাতে চারদিক সোরগোল পড়ে যায়। সর্বত্রই তাঁকে ধরতে লোক পাঠানো হয়।

রঘুনাথ ধরা পড়ার ভয়ে প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে, একাকি বনপথ ধরে দ্রুতবেগে শ্রীক্ষেত্রের দিকে যেতে থাকেন। কোনদিন আহার জোটে, কোনদিন জোটে না। ধনীর সন্তান রঘুনাথের সারা শরীর কাঁটার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। পা আর চলে না। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আবেগে রঘুনাথ সবকিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেন। বার দিনের মাথায় তিনি পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হন। খবর পেয়ে মহাপ্রভু প্রেমভরে তাঁকে আলিঙ্গন দান করেন। আর তাঁকে স্বরূপ গোস্বামীর হাতে সঁপে দেন।

রঘুনাথ এবার কঠোর বৈরাগ্যসাধন আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি সারা দিন ধরে কৃষ্ণনাম করা শুরু করেন। কৃষ্ণনাম শেষে জগন্নাথদেবের

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের কাছে না চেয়ে যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হত তাই খেয়ে জীবন-ধারণ করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু আস্তে আস্তে অন্যের দেওয়া এই ভিক্ষান্ন গ্রহণ থেকেও তিনি নিজেকে বিরত করে নেন।

জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দোকানদাররা প্রসাদান্ন বিক্রয় করে। দু'তিন দিনের বাসি অবিক্রীত প্রসাদান্ন তারা গোরুকে খেতে দেয়। এই পচে যাওয়া অন্নে এত গন্ধ যে গোরুও খেতে না পেরে ফেলে চলে যায়। কৃষ্ণ-নাম শেষে রঘুনাথ সেই অন্ন ধুয়ে খান। বৈরাগীকে সমস্ত রকমের লোভ ও ভোগ-সুখ থেকে দূরে থাকতে হবে। রঘুনাথ তাই এই পথ বেছে নিয়েছেন।

রঘুনাথের এই কঠোর ব্রত পালনের খবর মহাপ্রভুর কানে গেল। তিনি অন্তরে অন্তরে খুবই প্রীত হলেন। স্বরূপকে তিনি রঘুনাথের কাছে পাঠালেন, খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য। স্বরূপ সব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। রঘুনাথের এই কঠোর বৈরাগ্য দেখে খুশী হবেন তিনি। রঘুনাথের হাত থেকে সেই পচে যাওয়া অন্ন কেড়ে খেলেন।

"স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেহ কি তোমার প্রকৃতি ?"

স্বরূপের কাছ থেকে মহাপ্রভুও সব খবর পেলেন। একদিন তিনি স্বয়ং রঘুনাথের হাত থেকে তাঁর খাদ্য কেড়ে খেলেন—

"প্রভু বলে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
এছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

ধন্য রঘুনাথ! ধন্য তাঁর সাধনা। বৈরাগ্যের তিনি মূর্ত প্রতীক। বৈষ্ণবদের আচরণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলেছেন—

"তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লৈবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লইব—যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥"

রঘুনাথের জীবন-চর্চায় এর সবটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

রঘুনাথের এই ঘটনার কিছুদিন পর মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। রামচন্দ্রপুরীর ব্যবহারে মাধবেন্দ্রপুরী একবার খুব ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেন। এরপর রামচন্দ্রপুরী তাঁর চিত্তের সুস্থতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি সব সময় অন্যের দোষ ধরতে থাকেন। নীলাচলে এসে তিনি তাঁর অভ্যাসদোষ বশতঃ মহাপ্রভুর মধ্যেও দোষ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তিনি মহাপ্রভুর আহার গ্রহণ দেখে বললেন, এত বেশী আহার করা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। বেশী আহার, স্বাদু আহারে জিহ্বার তৃপ্তি সাধন হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ অকারণ উত্তেজিত হয়। উত্তেজিত ইন্দ্রিয় সর্বদা বশে থাকে না। একারণে সন্ন্যাসীকে শুধু প্রাণ ধারণের জন্য যেটুকু খাবার প্রয়োজন সেটুকুই গ্রহণ করতে হয়। মহাপ্রভু এ কথা শুনে তাঁর আহার গ্রহণ কমিয়ে দিলেন। এতে তাঁর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় ভক্তেরা হায় হায় করতে লাগলেন। তাঁরা অনেক করে মহাপ্রভুকে বললেন, কিন্তু প্রভু কিছুতেই রাজি হলেন না। কিন্তু মহাপ্রভু চিরদিনই ভক্তদের কথামত চলেছেন, তাঁদের মনে যাতে দুঃখ না হয় তার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক্ রামচন্দ্রপুরী নীলাচল ছেড়ে চলে গেলে ভক্তদের ব্যাকুলতা দেখে মহাপ্রভু আগের মতই সেবা গ্রহণে সম্মত হলেন।

প্রতি বছরই গৌড়ের ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে এসে পুরীধামে মিলিত হন। এবারেও তাঁরা এলেন এবং চারমাস ধরে মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলামৃত আস্বাদন করলেন। মহাপ্রভু সারা দিন কৃষ্ণ-কীর্তনে অতিবাহিত

করে রাত্রিতে রামানন্দ রায় ও স্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণ নীলারস আস্বাদন করতেন। আস্তে আস্তে কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর মধ্যে নানা বিকার দেখা দিতে লাগল।

একদিন মহাপ্রভু শুনতে পেলেন যে ভক্ত হরিদাস আর আগের মত সারা দিন কৃষ্ণ-নাম জপ করতে পারেন না এবং এর জন্যে তিনি সবার কাছে মনের দুঃখ জানান। মহাপ্রভু সবই বুঝলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে হরিদাসের দেহ-ভোগ শেষ হয়েছে, এবার তাঁর যাওয়ার পালা। তিনি তাই একদিন অন্য শিষ্যদের নিয়ে হরিদাসকে দেখতে গেলেন। হরিদাস তাঁকে দেখে করুণ স্বরে বলতে লাগলেন—"প্রভু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করবে। আমার একান্ত বাসনা, তোমার ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে, তোমার ঐ মুখচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি যেন মৃত্যু বরণ করতে পারি!"

হরিদাসের এই প্রার্থনা শুনে পরের দিন মহাপ্রভু অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে হরিদাসের গৃহে সংকীর্তন করতে করতে হরিদাসের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ ভক্তিভরে হরিদাসের চরণ-বন্দনা করলেন। হরিদাস প্রভুর চরণ শিয়রে নিয়ে, তাঁর মুখপানে চেয়ে নয়ন জলে ভাসতে লাগলেন। খুব ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর নামামৃত গাইতে গাইতে হরিদাসের প্রাণবায়ু নির্গত হল।

এরপর সমবেত ভক্তবৃন্দ সহ মহাপ্রভু সেই মরদেহকে সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে নাম-কীর্তন ও কৃষ্ণ-বন্দনা করলেন। তারপর সবাই মিলে সেই মরদেহ সমুদ্রতীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মৃতদেহকে সংস্কার করে হরিনামের কলরবের মধ্যে বালুকার নীচে সেই দেহ সমাহিত করা হল।

ফিরে এসে মহাপ্রভু ভক্তদের বললেন, হরিদাসের বিরহ-মহোৎসব ভালমত হওয়া চাই। ভক্তেরা সবাই আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু স্বয়ং সিংহদ্বারে বহির্বাস পেতে হরিদাসের জন্য ভিক্ষা চাইলেন। পশারীরা এগিয়ে এসে তাঁদের সাধ্যমত দান করলেন। সব জায়গা থেকে প্রচুর আহার্য বস্তু সংগৃহীত হল। সবাই মিলে খুব

ধুমধামের মধ্যে দিয়ে হরিদাসের বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করলেন। হরিদাসের মৃত্যুতে মহাপ্রভু আরো বেশী করে জগৎ-সংসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়ে, কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর দিন কাটতে লাগলো।

মহাপ্রভু দর্শন লাভের জন্য গৌড় থেকে আবার ভক্তেরা এলেন। ভক্তেরা অনেকেই প্রভুর জন্য নানা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছেন। জগদানন্দ প্রভুর মাথায় দেওয়ার জন্য এক কলসী সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছেন। তিনি সেটি প্রভুকে সমর্পণ করতে গেলে মহাপ্রভু জগদানন্দকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন—"আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত বিলাস-বৈভব থেকে দূরে থাকাই আমার ধর্ম। তুমি কি আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চাও?" মহাপ্রভুর এই বাক্যে চন্দ্রশেখর মনে খুব ব্যথা পেলেন। তিনি দুঃখ ও হতাশায় তেলের কলসীটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং উপবাস করতে লাগলেন। খবর পেয়ে মহাপ্রভু নিজে এসে জগন্নাথের হাতে সেবা পাওয়ার ইচ্ছা করলেন। জগন্নাথের মনের সব দুঃখ ও হতাশা দূর হয়ে গেল। তিনি সানন্দে নিজ হাতে নানা আহার্য বস্তু তৈরী করে প্রভুকে সেবা করলেন এবং তার প্রসাদ পেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। এরপর মহাপ্রভুর আজ্ঞা নিয়ে তিনি বৃন্দাবন গেলেন।

এই সময় কাশী থেকে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য এসে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ নিলেন। আপনার প্রিয় ভক্ত পুত্রের এই আচরণে মহাপ্রভু মনে মনে খুবই প্রসন্ন হলেন। তিনি রঘুনাথকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। দীর্ঘ আট মাস ধরে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন রঘুনাথকে। এরপর তিনি রঘুনাথকে পুনরায় পিতা-মাতার কাছে কাশীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন যে রঘুনাথ এখন গিয়ে পিতামাতার সেবা করুক। রঘুনাথ তাঁর আজ্ঞায় কাশীতে ফিরে গেলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় নীলাচলে ফিরে এলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সব নিবেদন করলেন। সব কিছু শোনার পর মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণ আর্তি দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগলো। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত প্রেম-বিকারে তিনি ক্রমশই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। সব সময়েই অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা। ভক্ত-বৃন্দ ও সেবকরা সবাই খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। সবাই মহাপ্রভুকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন।

একদিন রাত্রে ভৃত্য গোবিন্দ ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ দেখেন মহাপ্রভুর বিছানা খালি পড়ে আছে, মহাপ্রভু নেই। সবাই চিন্তিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। গোবিন্দ ও স্বরূপ গোস্বামী সর্বত্র খুঁজে খুঁজে অবশেষে তাঁকে সিংহদ্বারের পাশে দেখতে পেলেন। মহাপ্রভুর দীর্ঘ শরীর ধুলায় মাটিতে পড়ে আছে। অনেক দিনের কৃষ্ণ-বিরহজনিত বিকারে তাঁর শরীরের অস্থি-সন্ধি পর্যন্ত সব শিথিল হয়ে পড়েছে। উভয়েই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। খুব সাবধানে মহাপ্রভুকে তাঁরা তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ভাব যত দিন যেতে লাগলো, বেড়েই চলল। একদিন উপবন দেখে তাঁর বৃন্দাবন বলে ভ্রম হল। আর একদিন ভাবাবেশে দেখলেন, তিনি যেন বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের নিয়ে আনন্দে লীলা করছেন। চৈতন্য ফিরে পেয়ে ভক্ত-বৃন্দের কাছে এইসব ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহজনিত এইসব ঘটনায় ভক্তেরা সবাই খুব উৎকণ্ঠিত হলেন। সবাই মহাপ্রভুকে আরো চোখে চোখে রাখা মনস্থ করলেন।

আবার একদিন মহাপ্রভুর ঘরের দরজা বন্ধ অথচ মহাপ্রভু ঘরে নেই দেখে গোবিন্দ তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। এদিক-ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করে গোবিন্দ দেখতে পেলেন যে, মহাপ্রভু গাভীদের মাঝখানে পড়ে আছেন। তাঁর জ্ঞান নেই এবং দেহটি ভাব-উন্মাদনায় গুটিয়ে কচ্ছপের মত হয়ে গেছে।

ভক্তেরা এরপর থেকে আরো সতর্ক হলেন। সব সময়েই তাঁরা মহাপ্রভুকে ঘিরে থাকতেন। তবু এর মধ্যেই একদিন শরৎকালে এক জ্যোৎস্না রাতে তিনি সবার অলক্ষ্যে নীল সমুদ্রকে কালিন্দীর

কালজল ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর ঢেউ-এর দোলায় ভাসতে ভাসতে চলে গেলেন কোনারকের দিকে। ভাবাবেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের জলকেলি দেখতে দেখতে ভেসে চলেছেন। এক জেলে সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। জাল টানতেই তার জাল খুব ভারী বলে মনে হলো। জাল তুলেই সে অবাক। তার জালে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ দেহ এক দেবতার মত মানুষ। তাড়াতাড়ি জাল থেকে বের করে সেই দেহ সে ভূমিতে শুইয়ে দিল। কিন্তু দেহ স্পর্শ হতেই তার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে সবকিছু ভুলে 'হরি হরি' বলে নাচতে লাগলো।

এদিকে ভক্তেরা ততক্ষণ মহাপ্রভুকে না দেখতে পেয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে একদল খুঁজতে খুঁজতে কোনারকের পথে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর যেতেই তাঁদের সঙ্গে এক জেলের দেখা হলো। তাঁরা দেখলেন যে, সে হেসে-কেঁদে, 'হরি হরি' বলে নাচতে নাচতে আসছে। স্বরূপ গোস্বামী এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে এরকম্ করছে কেন? সেই জেলে তখন দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ দেহের কথা বললো। এবং এও জানালো যে, সেই দেহে ভূত এসে বাসা বেঁধেছে। আর দেহ স্পর্শ করা মাত্র সেই ভূত তার দেহে প্রবেশ করেছে। সে এখন ওঝার কাছে যাচ্ছে এই ভূত তাড়াতে।

সব শুনে স্বরূপ গোস্বামী বললেন- "ওগো জেলে, তুমি পরম ভাগ্যবান। তোমার জালে যিনি ধরা পড়েছেন তিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ভগবান। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলো।" জেলে তখন সাহস পেয়ে সবাইকে মহাপ্রভুর পাশে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভুর এই দশা দেখে অনেক ভক্ত চিৎকার করে কেঁদে ফেললেন। তারপর সবাই মিলে কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণ-সংকীর্তন শুরু করলেন। আস্তে আস্তে মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এলো। জ্ঞান-অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়ার বর্ণনা করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে

যখন তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি স্বরূপের কাছে শুনলেন যে তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কৃষ্ণ-বিরহ ও আর্তিতে এবং প্রলাপ ও বিলাপের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রভুর দিন কাটতে লাগলো। ভক্তেরা সবাই বুঝতে পারলেন, মহাপ্রভু আর বেশীদিন তাঁদের মধ্যে থাকবেন না। সবার মন খুব ভেঙ্গে পড়লো। তবু সবাই যথাসম্ভব মহাপ্রভুকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু একদিন জগদানন্দকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে তিনি নদীয়ায় জননী শচীদেবীর কাছে পাঠাতে চান। মহানন্দে একদিন জগদানন্দ জগন্নাথের প্রসাদ ও প্রসাদী বস্ত্র নিয়ে শচীদেবীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। একমাস নবদ্বীপে কাটিয়ে শচীদেবীর হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে জগদানন্দ আবার নীলাচলে ফিরে এলেন। মহাপ্রভুকে জননীর সব খবর দিলেন। আসার সময় অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে দেখা করার পর, অদ্বৈত প্রভু তাঁর হাত দিয়ে মহাপ্রভুর কাছে একটি বার্তা পাঠালেন। সবাই এই বার্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেও মহাপ্রভু কিছু বললেন না।

তবে এরপর থেকে মহাপ্রভুর মধ্যে কৃষ্ণ-বিরহ জনিত ব্যাকুলতা আরো বৃদ্ধি পেল। সবসময় প্রভু কৃষ্ণ-বিরহ ব্যথায় উদ্বেল হয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। কখনও স্বরূপ গোস্বামীকে বলতে লাগলেন—"হায় আমি কি প্রাণবঁধূকে আর দেখতে পাব না?" কখনও রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন—"বল, বল, বিধি আমার প্রতি এত অকরুণ কেন হলেন? আমি তাঁর কি অনিষ্ট করেছি যে, এই অমূল্য নিধি আমাকে দিয়ে আবার হরণ করে নিয়ে গেলেন।" মহাপ্রভুর এই আর্তি রামানন্দ হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। তিনি এবং স্বরূপ গোস্বামী কখনও শাস্ত্র আলোচনা, কখনও গান গেয়ে মহাপ্রভুর অস্থির চিত্তকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এখন থেকে গোবিন্দ ও স্বরূপ গোস্বামী উভয়েই গম্ভীরার দরজায় শুয়ে থেকে মহাপ্রভুকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করলেন। তবু এর

মধ্যেই একদিন রাত্রে জেগে উঠে ওঁরা দেখেন যে, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে দেওয়ালে মুখ ঘষে নাক-মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখে স্বরূপ একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। যাহোক অনেক চেষ্টায় তাঁকে শান্ত করে আবার তাঁকে শুইয়ে দিলেন তাঁরা।

এর কিছুদিন পরে বৈশাখী-পূর্ণিমার রাত্রে তিনি ভক্তদের নিয়ে কৃষ্ণ-সংকীর্তনে মেতে ওঠেন। জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের মধ্যে বসে এবং কবি জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' গান শুনে তাঁর মনে বৃন্দাবনের স্মৃতি জেগে ওঠে। অশোক গাছের নীচে তাঁর মনে হয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আবেগে ছুটে যান এবং মূর্ছিত হয়ে পড়েন। আবার, নাসিকায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পেয়ে চৈতন্য ফিরে পান এবং তাঁকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

এমনি করেই দিন কাটে। মহাপ্রভু, ভাবাবেশে স্বরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা বলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁদের স্ব-রচিত শ্লোক বলেন। এসব শ্লোকের মধ্যে দিয়ে নাম-সংকীর্তনের মহিমা, সংকীর্তন যে করবে তাঁর লক্ষণ ও গুণ, ভক্তিকামনা, দাস্যভক্তি, বিরহিণী শ্রীরাধিকার অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি এঁদের অবহিত করেন। এই শ্লোকগুলিকেই শিক্ষাষ্টক শ্লোক বলা হয়। মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মূল কথাগুলি এই শ্লোকের মাধ্যমেই বলা হয়েছে।

মহাপ্রভুর শেষ দিনগুলির সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ জীবনীকার, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় নীরব। তবে এ সম্বন্ধে তিন রকমের ব্যাখ্যা শোনা যায়। কেউ বলেন, মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল জলকে কালিন্দীর জল ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এতেই তাঁর দেহ-ভোগ শেষ হয়। আবার অনেকের মতে তিনি ভাবাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহকে আলিঙ্গন করে, সেই বিগ্রহের মধ্যেই লীন হয়ে যান। আবার অন্য একটি জনশ্রুতি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেবিত টোটা গোপীনাথ বিগ্রহের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে মিশে যান।

যাহোক মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তাঁর অনন্ত-লীলা বর্ণনা করা ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে অসম্ভব কাজ। মহাপ্রভুর জীবনকথা সমুদ্রের মত গভীর ও বিশাল। আমি তার এক ক্ষুদ্র অংশও যদি এই গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনা করতে পারি, তাহলেও নিজেকে ধন্য মনে করবো। মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম জানিয়ে, কৃষ্ণদাসের কথায় বলি—

'আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পারে।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবারে॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মাঝে যেন এক কণ ছুঁইল॥

———

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ